উৎস মানুষ

৩০ বর্ষ • ৩য় সংখ্যা • সেপ্টেম্বর ২০১০

## সূচিপত্র


| বিষয় | লেখক | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আমাদের কথা | | |
| আহরণ | | ২ |
| প্রলয়ঙ্কর টর্নেডো | অঞ্জনকুমার সেনশর্মা | ৪ |
| মাথা নত হয়ে যায় | পুলক লাহিড়ী | ৭ |
| গার্ডনার অভ বিলিফস | ভিটল সি নাদকার্নি | ৮ |
| হলুদ মঙ্গল কথা | উৎপল সান্যাল | ৯ |
| রোগের ভয়ের ব্যবসা | ভবানীপ্রসাদ সাহু | ১২ |
| একটি প্রতিবেদন | | ১৫ |
| জ্যোতিরাও ফুলে | প্রতুল মুখোপাধ্যায় | ১৬ |
| শরীরিণী-স্বৈরিণী | শাশ্বতী ঘোষ | ২৩ |
| গণপতি চক্রবর্তী | সমীরকুমার ঘোষ | ৩০ |
| অপু-র কথা | পূরবী ঘোষ | ৩৮ |
| ক্ষতিকর বর্জ্য | পি পি সিংগল | ৩৯ |
| চিঠিপত্র | | ৪০ |


**রেজিস্টার্ড অফিস** - বি ডি ৪৯৪
সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

**অস্থায়ী কার্যালয়**
**খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন**
বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬
ফোন ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/
৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com
ই-মেল : jhilly_banerjee@yahoo.co.in
banerjee.jhillee2@gmail.com

# আমাদের কথা

১৯৮০-দশকের মাঝামাঝি যেটাকে উৎস মানুষ-এর স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে, অনেক আগ মার্কা যুক্তিবাদীকেও বলতে শোনা গেছে, উৎস মানুষ সি আই-এর টাকায় চলে। পরে অনেকে 'নকশালদের পত্রিকা' বলেছে। সম্প্রতি কতিপয় 'বুদ্ধিজীবী' তৃণমূল বলতেও শুরু করেছেন। উৎস মানুষ-এর টুপিতে নতুন পালক। আক্ষেপ একটাই পালক আসছে পালক মানে প্রতিপালক আসছে না। একটু বিজ্ঞাপন, ভাল লেখা, গায়েগতরে খাটার লোক যদি পাওয়া যেত!

যাদের এ দেশের কোনও ভাল জিনিসই চোখে পড়ে না, তাদের জন্য সুখবর—ভারতের লোকেদের বাড়িতে বাথরুম করার জায়গা না থাকলেও হাতে মোবাইল আছে! রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাম্প্রতিক রিপোর্ট জানিয়েছে, 'মোর পিপল হ্যাভ অ্যাকসেস টু আ মোবাইল টেলিফোন দ্যান টু আ টয়লেট।' আমরা কাজের থেকে কথা ভালবাসি। নেতা-মন্ত্রীরা যত কথা বলেন সেগুলোকে বস্তুতে রূপান্তর করলে আরও কত যে হিমালয় পেতাম! রামপ্রসাদ বলতেন—সময় তো থাকবে না গো মা, কেবলমাত্র কথা রবে। অন্তত কথাতেই দেশটা এগিয়ে চলুক!

সংবাদে প্রকাশ, জন্মাষ্টমীর আগেই অনেকে নার্সিংহোম বুক করেছেন। কৃষ্ণ জন্মমুহূর্তেই আপন আপন স্ত্রীর পেটে কেটে কৃষ্ণ ভূমিষ্ঠ করাতে চান। সে সন্তান ৬-৮ মাসের হলেও ক্ষতি নেই। একটা কৃষ্ণের ঠেলা সামলাতেই ভারতবাসীর জান বেরিয়ে গেছে। এরপর ঘরে ঘরে কৃষ্ণ এলে কী হবে ভাবতেও শঙ্কা হচ্ছে। এই কৃষ্ণরা শিশুবয়সে ননীচুরি করতে পারবে না। কারণ নন্দ-যশোদারা এখন মার্জারিন খান। এখনকার গোপিনীরা কাপড় পরেন না। যা পরেন তার হরণ করার কিছুই থাকে না। রাধা, দ্রৌপদী, মীরার মতো পরস্ত্রীর দিকে হাত বাড়ালে তাদের স্বামীরা ছেড়ে দেবেন না। আয়ান ঘোষেদের আশি বছরে বুদ্ধি হত। এ যুগের আয়ানরা পাড়ার রাজুভাই মানে রাজনৈতিক দাদা এবং পুলিসের তাবড় কর্তাকে লেলিয়ে দিয়ে লাশ ফেলে দেবেন। রাজনৈতিক দলগুলোর একজনকে আরেক জনের পেছনে লাগিয়ে দেওয়ার কাজেও এখন প্রচুর লোক/প্রচার মাধ্যম! কোনও কাজ না পেয়ে বেচারা কৃষ্ণ কী করবেন, নন্দ-যশোদারা একবারও ভেবে দেখলেন না!

**সম্পাদকমণ্ডলী**

আহরণ

# আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র

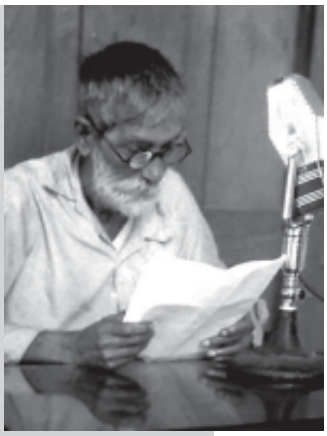

## শ্রী চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য*

(বসুধারা, শ্রাবণ-১৩৬৬)

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বয়স যখন সত্তর বছর পূর্ণ হল তখন তাঁর দেশবাসী এক বিরাট সভায় তাঁকে অভিনন্দিত করে। এই উপলক্ষে তাঁকে একখানি স্মারক-গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়। বহু মনীষী তাঁদের লেখা দেন।

মহাত্মা গান্ধী তখন যারবেদা জেলে। সেখান থেকে লেখেন।—

> Acharya Ray I had the privilege of knowing for the first time when Gokhale was his next-door neighbour in 1901 and I was undergoing tutelage under the latter. It was difficult to believe that the man in simple Indian dress and wearing simple manners could possibly be the great scientist and Professor he even then was. And it took my breath away when I heard that out of his princely salary he kept only a few rupees for himself and the rest he devoted to public uses and particularly for helping poor students.
>
> Y. C. P. M. K. Gandhi
> 24-5-32

১৯০১ সালে আচার্যদেবকে প্রথম দেখলুম। প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি। রুটিনে দেখলুম প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের ক্লাস নেবেন। প্রথম দিনের ক্লাস, ছুট্‌তে ছুট্‌তে গিয়ে গ্যালারিতে বসলুম। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ল; বেয়ারা এসে রেজেষ্টারি দিয়ে গেল। দেখি, বেয়ারার গায়ে চৌখুপি ছিটের সূতির একটা কোট। এবার প্রবেশ করলেন আচার্যদেব। দেখি, তাঁর গায়ে অবিকল সেই ধরণের এক কোট। এটা কেমন করে

ভদ্রলোক গেলেন, কিন্তু তখনই ফিরে এসে দরওয়ানকে বললেন,—ওঘরে একজন দপ্তরী বই জুড়ছে দেখলুম, আর তো কেউ নেই।

আচার্যদেবের পরণে ছিল একখানা লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি—একখানা বই-এর পাতা ছিঁড়ে গেছল, তিনি তখন তাই জুড়ছিলেন।

ওই স্মারক-গ্রন্থে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু লিখেছেন,—

> "The association of plain living and high thinking is always very rare; in addition to these there is in Sir P. C. Ray the element of vigorous action which knows no rest. The combination of such qualities in a single individual is indeed rare in any country, and there can be no higher example for the young generation to emulate than the life of this great teacher."

জ্যৈষ্ঠ মাস, সকাল থেকে গুমট ক'রে রয়েছে। সতীশ মিত্র এল; এসে বলল—আমি আচার্য প্রফুল্ল রায়কে কোনোদিন কাছে থেকে দেখিনি, তাঁর কাছে নিয়ে চলুন।

বেরলুম দু'জনে। তখন তিনি থাকেন সায়েন্স কলেজের দোতলার দক্ষিণ দিকের এক ঘরে। তিনি ঘরেই ছিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হল। ঘর থেকে বেরলুম।

বাইরে এসে সতীশ বলল,—ওঁর ঘরে পাখা নেই দেখলুম। আমি আজ দুপুরে ওঁর ঘরে একখানা পাখা টাঙ্গিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

—দাঁড়াও, ওঁর অনুমতিটা নিই।

আবার দু'জনে ঘরে ঢুকলুম। সতীশের প্রস্তাবটা বললুম। গুম্ করে আমার পিঠের ওপর একটা কিল পড়ল। দরজাটার দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে বললেন,—এটা কোন্ দিক?

—কেন, দক্ষিণ দিক।

—তবে?

এই "তবে" কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলুম। বললেন,

—প্রচুর হাওয়া আসে ঘরে, পাখার কোনো দরকার নেই।

হতবাক্ হয়ে যে যার বাড়ি ফিরলুম।

আমাদের দেশের বাড়িতে একদিন ছিলেন। ফেরবার সময় জলখাবার দেওয়া হয়েছে। একখানা চন্দ্রপুলির একটুখানি ভেঙ্গে নিয়ে মুখে দিয়ে বললেন,—এগুলো সব বেঁধে দাও, নিয়ে যাবো। সকালে ছেলেগুলো আসে, খুব আমোদ করে খাবে।

সকালের তাঁর নিজের আহার্য থাকত সাধারণতঃ সিরাপ-মাখা মুড়ি। একদিন দুপুরবেলায় গিয়ে দেখি, কুকারে তাঁর জন্যে রান্না হচ্ছে—ভাত, মসুর-ডাল ও আলু সিদ্ধ।—

এই খাওয়া: আর পরার কথা আগে বলেছি। এই

* গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর এ-লেখা পাঠাবার কিছুকাল পরেই পরলোকে প্রয়াণ করেছেন।

খাওয়া-পরার জন্যে কয়েকটা টাকাই যথেষ্ট। আর—বাকি, মহাত্মজী যা বলেছেন,—

Devoted to public uses and particularly for helping poor students.

(বসুধারা, আশ্বিন-১৩৬৪)

আচার্যদেবের সপ্ততিতম জন্মোৎসব হল ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩২ সাল। স্থান—টাউনহল।

জয়ন্তী কমিটির সভাপতি ছিলেন নীলরতন সরকার; সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বললেন।—

"আমরা দুজনে সহযাত্রী।

কালের তরীতে আমরা প্রায় একঘাটে এসে পৌঁছেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।

আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবলমাত্র জ্ঞান দেন নি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে।

বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন। কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়ার প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

আচার্য নিজের জয়কীর্তি স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে—পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।

আমরাও তাঁর জয়ধ্বনি করি।"

এই জয়ন্তী উপলক্ষে চাঁদা উঠেছিল প্রায় সতের হাজার টাকা। আর খরচ হয়ে ছিল একশ সাতচল্লিশ টাকা।

চিঠির কাগজ, হ্যান্ডবিল, পোষ্টার প্রভৃতির জন্য কাগজবিক্রেতারা কাগজ দিয়েছিলেন অমনি। ছাপাখানা অমনি ছেপেছিল।

যাঁরা চাঁদা আদায় করতে বেরুতেন তাঁরা ট্রামভাড়া নিজেদের গাঁট থেকে দিতেন। বিশেষ কারণে মোটর দরকার হলে এক ভদ্রলোক পেট্রল-সমেত তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। হিসাব-রক্ষক পয়সা নিতেন না। রোজ সন্ধ্যায় এসে খেটে দিয়ে যেতেন। অনুষ্ঠানের দিন মিউনিসিপাল মার্কেটের ফুলওয়ালা বিনা পয়সায় ফুল দিয়েছিল। অক্সিজেন-সিলিন্ডার অমনি পাওয়া গিয়েছিল। স্বেচ্ছাসেবকরা নিজ নিজ পয়সায় চা খেয়ে আসত। সেদিন ছুটাছুটি করবার জন্য চারখানি মোটরের যোগাড় হয়েছিল। দরওয়ানরা বক্‌শিশ নিল না।

সরকার কান মলে ষ্ট্যাম্প ও টেলিগ্রামের খরচ নিল। করপোরেশন টাউন-হল ভাড়া মকুব করতে পারল না। তাদের আইনে আটকায়। এই দুই বাবত নগদ যে একশ সাতচল্লিশ টাকা খরচ হল তা উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিন জন দিয়ে দিলেন। বহু মনীষীর রচনায় সমৃদ্ধ এক স্মারক-গ্রন্থ আচার্যদেবকে উপহার দেওয়া হল; তার প্রকাশের সমস্ত খরচ বহন করলেন একজন ধনী বিজ্ঞানী।

আদায়ী সতের হাজার টাকা পুরো মজুত রইল। তা বেড়ে আজ পঁচিশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। কাগজ কিনে সরকারের হেফাজতে রাখা আছে; সুদ যা আসে দরিদ্র ছাত্রদের মাইনে দিতে বই কিনতে দেওয়া হয়। একটি পরিচালক কমিটি আছে।

উমা


সাপের কামড়ে

সাহায্য-ফোন

(হেল্প লাইন) ০৩২১৮-২১৬০০৬

৯৬৩৫৯৯৫৪৭৬

৯৭৩৩৮২২৮২৫

২৪ ঘণ্টা আপনাদের পাশে, সঙ্গে অগ্রণী চিকিৎসকগণ।

**যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং**

**দক্ষিণ ২৪ পরগনা**


# অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

# স্মারক বক্তৃতা

২০ নভেম্বর ২০১০

শনিবার, বিকেল পাঁচটায়

জীবনানন্দ সভাঘরে

**বক্তা: তুষার কাঞ্জিলাল**

# প্রলয়ঙ্কর টর্নেডো

অঞ্জনকুমার সেনশর্মা

Tornado in Central Oklahoma, USA

প্রকৃতি তার আর এক করাল মুখ আমাদের দেখিয়ে গেল। উত্তরবাংলা আর তার দু'পাশের বিহার আর বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ওপর ১৩ এপ্রিল ২০১০ রাতে কয়েক মিনিটের তাণ্ডবে শতাধিক প্রাণ নিয়ে, কয়েক সহস্র ঘরবাড়ি ধ্বংস করে কোটি কোটি টাকার ফসল নষ্ট করে যে ঝড়টি বয়ে গেল সেটি এক বিশেষ ধরনের ঝড়—বাতাসের সব থেকে প্রলয়ঙ্কর রূপ—নাম টর্নেডো। (আর বলতেই হয় টোর্নেডোর মধ্যেও এটি ধ্বংসের ব্যাপকতায় আমাদের দেশে বিশিষ্টভাবে দাবিদার)।

এ দেশে আমরা সাধারণত দু'ধরনের ঝড়ের সঙ্গে পরিচিত—(১) গ্রীষ্মের ঝড় যেমন আমাদের 'কালবৈশাখী' আর (২) বর্ষার আগে সামুদ্রিক ঝড়। যেমন লাইলা। 'টোর্নেডো' তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরল একটি তৃতীয় ধরনের ঝড়। এর কোনো আলাদা অস্তিত্ব নেই, বাকি দু'ধরনের ঝড়ের, প্রধানত গ্রীষ্মের ঝড়ের থেকেই এর উৎপত্তি এবং সেটা সম্ভব হয় মাত্র তখনই যখন এ দুটো সম্ভব কোনো একটি ঝড় খুব বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

আকারে ও স্থায়িত্বে এ দু'ধরনের ঝড় থেকে অনেক ছোটো এই তৃতীয় ঝড়ের কিছু মিল দ্বিতীয়টির সঙ্গেই। সামুদ্রিক ঝড় ও টোর্নেডো দুটোই বাতাসের ঘূর্ণি তবে যেখানে সামুদ্রিক ঝড়ের গড় ব্যাস কয়েকশো কিলোমিটার সেখানে টোর্নেডোর পরিধি খুব বেশি হলে কয়েকশো মিটার মাত্র। এবং সামুদ্রিক ঝড়ের মতই টোর্নেডোরও দুটো গতি। একটা গতি চক্রাকার ঘূর্ণিতে বাতাসের, যা থেকে আসে তার বিধ্বংসী ক্ষমতা। অন্যটি পুরো ঘূর্ণিটা যে গতিতে চলে, খুব বেশি হলে ঘণ্টায় ৬০ কি মি। কিন্তু দেহটি অত্যন্ত শীর্ণ হলে কি হবে প্রচণ্ড এর ঘূর্ণির বেগ। যেখানে সামুদ্রিক ঝড়ের ঘূর্ণিতে হাওয়ার সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৩০০ কি মি ছাড়ায় না সেখানে টোর্নেডোর ঘূর্ণিতে হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৪৫০ কি মি পর্যন্ত হতে পারে। বাকি দু'ধরনের ঝড়ের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিধর হলেও এ ঝড় স্থায়িত্বের দিক থেকেও অনেক অনেক ছোটো। যেখানে একটি সামুদ্রিক ঝড় স্থায়ী হয় কয়েক দিন, কালবৈশাখী কয়েক ঘণ্টা, টর্নেডো সেখানে স্থায়ী হয় মাত্র কয়েক মিনিট। ভাগ্যিস কয়েক মিনিট মাত্র, কারণ এই শীর্ণ কলেবর নিয়েও ওই সামান্য সময়ের মধ্যে এ যা ক্ষতি করতে পারে তা থেকে অনুমান করতেও ভয় হয় এর স্থায়িত্ব আরও বেশি বা কলেবর আরও বড় হলে ধ্বংস কত মারাত্মক হতে পারতো।

টোর্নেডো বলতে বোঝায় মেঘ থেকে নেমে আসা দীর্ঘ অথচ শীর্ণ, হাওয়ার প্রচণ্ড একটি ঘূর্ণি। এর চেহারা ও আয়তন নানা ধরনের হয়ে থাকে কিন্তু সাধারণত দেখতে হয় অনেকটা তেল ঢালার ফানেলের (funnel) মত, যার সরু দিকটা মেঘ থেকে মাটির দিকে ঝোলানো। বা অনেকটা একটা হাতির শুঁড়ের মতো, মাথা থেকে সরু হয়ে নেমেছে। একটা চলমান হাতির যেমন, এই শুঁড়টাও তেমনই দুলতে দুলতে চলতে থাকে, কখনও কখনও ডগাটা বেঁকে বা সঙ্কুচিত হয়ে মাটি থেকে ওপরে উঠে যায়। কোনো কোনো অঞ্চলে এটিকে তাই 'হাতিশুঁড়া'-ও বলা হয়ে থাকে। 'ফানেলে'র মতো দেখতে বলে একে ইংরেজিতে 'ফানেল মেঘ'ও বলা হয়।

শীর্ণদেহী বলেই এই 'ফানেল'কে দেখতে পাওয়া সম্ভব। অন্যদিকে সামুদ্রিক ঝড়ের ব্যাপ্তি এত বড় যে কোনো এক জায়গা থেকে এর ঘূর্ণি রূপটা অনুধাবন করা যায় না। তবু টর্নেডো দেখতে

পাওয়া মুস্কিল। চারদিক অন্ধকার করা মেঘের আস্তরণ, সঙ্গে ঝড়, তুমুল বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি—এ সবের মধ্যে কালো মেঘের প্রেক্ষাপটে ওই রঙেরই শুঁড়টিকে দিনের বেলাতেই আলাদা করা কঠিন, রাতে তো কথাই নেই।

ঘূর্ণির বহিরঙ্গের রূপ না হলেও এর অন্তঃস্থলটা দেখার সৌভাগ্য তবু এবার 'ভাগশালা' গ্রামের জনৈকের হয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন '...কোনো এক দস্যু এসে ঘরের চাল, বেড়ার টিন টেনে ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি চরকির মতো আস্ত সব টিন শাঁ শাঁ শব্দ করে উড়ছে আর পাক খাচ্ছে।' (আজকাল, ১৫ এপ্রিল, পৃ:৫)

টোর্নেডোর উপস্থিতি টের পাওয়া যায় তীব্র কর্কশ যান্ত্রিক আওয়াজ থেকেও। ১৯৮৩ সালে উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় চোর্নেডোর (এর বিষয়ে সে বছরের জুন মাসে এই পত্রিকায় একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল) সময় অনেকে ভেবেছিলেন কাছ দিয়ে আবার ঘড়ঘড় করে ট্যাঙ্ক যাচ্ছে। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় সামরিক ট্যাঙ্কের শব্দের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছিল (এই লেখকের অভিজ্ঞতায় আছে খুব নীচ দিয়ে প্রায় যেন মাথার ওপর দিয়ে একটি বড় জেট প্লেন যাবার শব্দ।) উপস্থিতির প্রমাণ হিসেবে রেখে যায় গামছা নিংড়োনোর মতো মোচড়ানোর চিত্র। আর রেখে যেতে পারে সামান্য দূরত্বে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে উপড়ে পড়া গাছ। বা যেমন হয়েছিল এবারে 'টুনভিটা' গ্রামে। সেখানে জনৈকের 'ঘরের দুপাশের দুটো আলমারি একে অপরের ওপর পড়ে'। (তদেব)

টর্নেডোর ঘূর্ণিটা শুরু হয় ওপরে, মেঘের ভেতর থেকে। তাই এর ওপরের অংশের দৃশ্যমানতা মেঘের মতই, জলকণার জন্য। আস্তে আস্তে এই ঘূর্ণি নিচের দিকে প্রলম্বিত হতে থাকে। মাটির কাছাকাছি পৌঁছলে ধুলো বালি আর উপড়ে আনা ধ্বংসাবশেষ ঘূর্ণির নিচের অংশটাকে দৃশ্যমান করে দেয়। এই ঘূর্ণির একটা প্রচণ্ড শুষে নেবার শক্তিও থাকে। যার ফলে নিচের এই দৃশ্যমান অংশ ক্রমশ ওপরে উঠে নিচের দুটো অংশকে জুড়ে একটা অখণ্ড চেহারা দেয়।

টোর্নেডোর এই তীব্র অবিশ্বাস্য শোষণ ক্ষমতা এর আরেকটা বৈশিষ্ট্য, যার ফলে এ শুধু ভেঙে চুরে উপড়ে দুমড়ে ক্ষান্ত হয় না, তুলে নিয়ে চলে যায়। যেমন এবারের টর্নেডোয় 'এক গ্রামের ঘর উড়ে গিয়ে পড়েছে অন্য গ্রামে। মাঝে মাঝে দু'চারটে করে আস্ত দোকানঘরই নিরুদ্দেশ হয়েছে।' 'চকডাঙ্গি' 'গ্রামে আস্ত একটি ধানের কল উড়িয়ে নিয়ে গেছে। আরও একটি ধানের কল তুলে দু' কি মি দূরের ধানের ক্ষেতে ফেলে রেখে গেছে।' (তদেব) কোনো জলাশয়ের ওপর দিয়ে টোর্নেডো গেলে সেখানে থেকে জল শুষে নেয় (যেমন আমরা 'স্ট্র' দিয়ে সরবৎ খাই), এমনকি ছোটোখাটো পুকুরকে শুকনোও করে দেয়। শেষে টোর্নেডো যখন দুর্বল হয়ে যায় তখন সেই জল আবার নেমে আসে। কখনও কখনও আকাশ থেকে ছোটো ছোটো জ্যান্ত মাছ পড়ে বেশ খানিকটা দূরের মানুষকে চমকে দেয়।

টোর্নেডোর বিধ্বংসী ক্ষমতা ওই শীর্ণ ঘূর্ণিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ঘূর্ণির বাইরে বা নিচে সে ক্ষমতার কোনো চিহ্ন থাকে না। টোর্নেডোরে নিচের ডগা যখন কিছুক্ষণের জন্য মাটি থেকে উঠে যায় মাটির ওপরেও কিছু ধ্বংস হয় না। কিছুক্ষণ বাদে কিছু দূরে টোর্নেডো আবার যেখানে মাটি ছোঁয় সেখানে থেকে ধবংস শুরু হয়। টোর্নেডোর এই খামখেয়ালীপনাতে গাইঘাটায় একটি মন্দির বেঁচে গিয়েছিল। সামনে পেছনে আশেপাশে ধ্বংস্তূপের মধ্যে ছোট্ট মন্দিরটি অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে দেখে ভক্তরা ঈশ্বরের মহিমা ভেবে আপ্লুত হয়েছিলেন।

দক্ষিণ বাংলার জলাকীর্ণ অঞ্চলে নদীনালার ওপর অনেক সময় টোর্নেডো দেখা যায় মেঘের থেকে জল পর্যন্ত খাড়া একটা থামের মতো। বলাও হয় 'জলস্তম্ভ'। তবে এগুলো সাধারণত ডাঙার ওপরের টোর্নেডোর মতো, অবশ্যই তুলনামূলকভাবে, অতটা বিধ্বংসী হয় না। অভিজ্ঞ মাঝিমাল্লারাও এগুলো এড়াবার পন্থা জানেন।

টোর্নেডো মূলত পৃথিবীর উষ্ণ বলয়ের ঝড়, যদিও দক্ষিণ মেরু ছাড়া আর সব মহাদেশেই একে দেখা গেছে। আমাদের দেশে টোর্নেডো খুবই বিরল। তারই মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাব্য অঞ্চল হচ্ছে গাঙ্গেয় সমতলভূমির পুরোটা, আসাম ও সন্নিহিত রাজ্যগুলো, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা। এর মধ্যে সিংহভাগই ঘটে উত্তর পূর্ব ভারতে (৭২%)। এত শীর্ণদেহী ও ক্ষণস্থায়ী বলে কোনো সাধারণ আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থায় একে ধরা যায় না। দৈবক্রমে যদিও বা টোর্নেডো কোনো পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ওপর এসেই পড়ে ত' পুরো কেন্দ্রটিই ধ্বংস করে দিয়ে যায়। এর গঠন বা অন্যান্য বিবরণ কোনো যন্ত্রে এখনও ধরা যায় নি। শুধু মাত্র ধ্বংসের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করেই টোর্নেডো সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞান তা সংগ্রহ করতে হয়েছে। কী কারণে কতকগুলো ঝড় অতিরিক্ত তীব্র হয়ে টোর্নেডোর জন্ম দেয় তাও এখনও স্পষ্ট নয়। তাই আলাদা করে টোর্নেডোর পূর্বাভাষ দেওয়া এখনও সম্ভব হয় নি। সে কারণে কালবৈশাখী জাতীয় ঝড় যে সব অঞ্চলে প্রবল হবার সম্ভাবনা সে সব অঞ্চলকেই টোর্নেডো আবির্ভাবের সম্ভাব্য অঞ্চল বলে ধরে নিতে হয়।

টোর্নেডোর প্রকোপ যেখানে সব থেকে বেশি সেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টোর্নেডো প্রবণ অঞ্চলে এ ভাবেই সতর্কবার্তা দেয়া হয়। বায়ুমণ্ডলের পরিস্থিতি অনুযায়ী যে অঞ্চলে বিশেষ শক্তিশালী

ঝড়ের মেঘ তৈরি হতে পারে সে অঞ্চলটি চিহ্নিত করে 'টর্নেডো প্রহরা' চালু করা হয়। এর পর থেকে আবহাওয়া বিভাগের বিশেষ দূর নিরীক্ষণ যন্ত্রজাল ও কর্মী ছাড়াও বহু স্বেচ্ছাকর্মী এই পুরো অঞ্চলের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কোনো টোর্নেডো কোনোভাবে দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে সেটার অবস্থা ও গতিপথ জানিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে সেটি রেডিও ও টেলিভিশন মারফৎ স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রচার করা হয়। এবং তখন থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়—'টোর্নেডো সতর্কীকরণ' (Tornado Warning)। টোর্নেডোটিকে প্রতিনিয়ত নিরীক্ষণে রাখা হয় এবং পুরো নিশ্চিহ্ন হলে তবেই এই পর্যায় শেষ হয়। এই প্রক্রিয়ায় গড়ে মোটামুটি ১৫ মিনিট মতো আগাম সতর্কীকরণ সম্ভব। টোর্নেডো প্রবণ ঋতু জুড়েই এই বন্দোবস্ত চালু থাকে। আমাদের মতো গরীব দেশে এ জাতীয় ব্যবস্থার জন্য যে জাতীয় পরিকাঠামো দরকার সেটা সাধ্যাতীত। আমাদের তাই ঝড়ের পূর্বাভাষেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

প্রশ্ন স্বাভাবিক, আর কোনো ভাবে কি অগ্রিম সতর্কবার্তা পাওয়া সম্ভব? যেমন শোনা যায় কিছু কিছু পশুপাখি আগাম ভূমিকম্প অনুভব করতে পারে তেমন কিছু? জানা যায় নি। সাধারণ মানুষকে তাই ঝড়ের ঋতুতে বিশেষ কিছু সতর্কবার্তা মেনে চলতেই হবে। যেমন ঝড়ের মেঘ দেখলে অকারণে বাড়ির বাইরে না থাকা, ঝড় উঠলে দ্রুত আশ্রয় নেয়া, তবে গাছতলায় নয়। নিরাশ্রয় অবস্থায় কাছাকাছি টোর্নেডোর উপস্থিতি টের পেলে (যেমন শব্দ থেকে বা আকাশে চক্রাকারে কিছু ঘুরতে দেখলে) উপুর হয়ে হাত দিয়ে মাথা ঢেকে শুয়ে পড়া ইত্যাদি।

জানতে ইচ্ছে হতে পারে একবার টর্নেডো হয়ে গেলে সেখানেই কি আবার হতে পারে? কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন শোনা যায় কামানের গোলার গর্তগুলোই সবচেয়ে নিরাপদ। দ্বিতীয় গোলা পড়বে না। টোর্নেডোর খামখেয়ালীপনার কথা আগেই বলা হয়েছে। এরকম অতীত নিদর্শন আছে যে টোর্নেডো আবার ঘুরে একই জায়গায় চলে এসেছে। তাই ঝড় পুরো শান্ত না হওয়া পর্যন্ত সাবধান থাকাই বাঞ্ছনীয়। একবার ঝড় শান্ত হয়ে গেলে বিপদ কেটে গেছে ধরে নেয়া হয়। তবে অন্য কোনো দিন সেই একই অঞ্চলে আবার টর্নেডো? হ্যাঁ, হতে পারে বৈকি। সতত পরিবর্তনশীল সচল বায়ুমণ্ডল সেই অঞ্চলে আবার কোনো একদিন কোনো এক সময়ে আবার সেরকম পরিস্থিতির উদ্ভব করলে হতে কোনো বাধা নেই। তবে টর্নেডো ঘটনা হিসেবে খুবই বিরল, তাই সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে একই জায়গার একাধিকবার হওয়ার সম্ভাব্যতা খুবই কম।

উষ্ণায়নের প্রবক্তাদের মতে আবহাওয়ার এ জাতীয় চরম রূপ সংখ্যায় ও তীব্রতায় ক্রমে বেড়ে যাবে। স্বস্তির কথা এর প্রমাণ এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

## আইলা প্রসঙ্গে আরও কিছু

### নাম রহস্য

মানুষকে যে কারণে নাম দেওয়া হয় সামুদ্রিক ঝড়গুলোকেও সে কারণেই—সহজে চিহ্নিত করার জন্য। অন্য কোনো ঝড়ের নামকরণের প্রয়োজন হয় না ক্ষণস্থায়ী বলে। সামুদ্রিক ঝড়ের আয়ুষ্কাল কয়েকদিন—কখনও কখনও দিন দসেকের মতোও এবং এই পুরো সময় ধরে সতর্কবার্তা প্রচার করতে হয় সাধারণের উদ্দেশ্যে। কখনও এমনও হয় যে একই সঙ্গে দু'দুটি ঝড়ের জন্য সতর্কবার্তা দেবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই পরিস্থিতি ছাড়াও নামকরণ করা থাকলে সতর্কবার্তার প্রেরক ও গ্রাহক দু পক্ষেরই ঝড়টিকে চিহ্নিত করা সহজ হয়।

নাম থেকে শক্তির তারতম্য বোঝা যায় না। যেমন একজনের নাম 'গোপাল' বলে সে 'বিমলের' থেকে শক্তিধর বোঝায় না তেমনি একটি ঝড় 'আইলার' থেকে শক্তিশালী বলে তার নাম 'লায়লা' তেমন নয়। এ অঞ্চলের (ভারত মহাসাগরের উত্তরভাগ) ঝড়েদের নামকরণ হয় আটটি দেশের (ওমান, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশে, শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপ) পাঠানো নামের তালিকা থেকে পর্যায়ক্রমে এক এক করে। ভাষা বিভিন্ন বলে আমাদের কানে কোনো কোনো নাম অদ্ভুত শোনায়।

**বীজ:** জানুয়ারি ২০১০ সংখ্যায় পৃ: ১৭-র প্রথম কলামের তৃতীয় প্যারাগ্রাফের প্রথম বাক্যে (গবেষণার কার্যক্রমের ... উদ্বুদ্ধ করা) 'বীজ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু অনবধান বশত কোথাও ব্যাখ্যা করা হয় নি।

আসলে ১৬ পৃষ্ঠার ২য় কলামের প্রথমেই বাক্য টি আছে (গবেষণাগারের ... করা সম্ভব) তাতে যে 'সূক্ষ্ম কণা'র কথা আছে সেগুলিকেই এই প্রসঙ্গে 'বীজ' (Seed) বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে কারণ আমরা যেমন জমিতে কাঙ্খিত ফসলের জন্য 'বীজ' বপন করি তেমনই মেঘের মধ্যেও এই 'সূক্ষ্ম কণা'গুলো বপন করা হয় মেঘে কাঙ্খিত পরিবর্তন আনার আশায়।

দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ

প্রবন্ধের ৩য় প্যারার প্রশ্নটির উল্লেখ একটি চলতি ধারণা বলেই। ধারণাটা যে ভিত্তিহীন সেটা পরবর্তী প্যারাতেই স্পষ্ট করা হয়েছে। বাস্তবে যেটা হয়েছে তা হচ্ছে ওদেশের উপকূলের সব মানুষ জনসাধারণ, প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সবাই সামুদ্রিক ঝড়ের আশঙ্কা থাকলে কি কি করণীয় সে ব্যাপারে একটা পরিষ্কার ধারণা করে নিতে পেরেছেন। এবং সেটা হয়েছে ঘনঘন বিপর্যয়ের কারণেই। বহুদিন অচল থাকলে যে কোনো যন্ত্রই স্বাভাবিকভাবে স্লথ হয়ে যায়। অপরদিকে কথাই আছে, 'অভ্যাসে আসে উৎকর্ষ'। আমাদের দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থাও সেই কারণে। তুলনামূলভাবে কিছুটা হয়ত বিলম্বিত। উ মা

# মাথা নত হয়ে যায়, বারে বারে

**পুলক লাহিড়ী**

একঝুঝকো সাঁজ বেলায় ঝাড়গ্রাম শহর থেকে দূরে এক অনামা গ্রামে আমার বাড়ির বারান্দায় বসেছিলাম। বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেছে রাঙ্গামাটির রাস্তা। তৃষ্ণার্ত পথিকরা বাড়ির কুয়ো থেকে জল পান করে, গা-মাথা ভিজিয়ে আবার রওনা দেন দূর দূরান্তে। সেদিন কয়েকজন আদিবাসী স্থানীয় মানুষ এসেছিলেন; ঘরে ফেরার পথে দু'দণ্ড জিরিয়ে গল্পগুজব করবেন বলে। আমি যখনই ঐ বাড়িতে যাই, এরা আসেন। নানা বিষয়ে কথা হচ্ছিল; এঁরা লেখাপড়া তেমন করেন নি, কিন্তু নানা বিষয়ে জানার খুব উৎসাহ। কথাবার্তার ফাঁকে তৃষ্ণা মিটিয়ে বারান্দায় এসে বসলেন ভূপতি সরেণ; বয়স ও দারিদ্র তাঁর শরীরে নানা আঁকিবুকি কেটেছে। কথা হচ্ছিল ভারতের উত্তর আর দক্ষিণের নদীগুলোর সংযুক্তি নিয়ে—ভাবলাম দেখি প্রবীণ এই আদিবাসী এ বিষয়ে কি বলেন। আলোচনার বিষয় তাঁকে বুঝিয়ে বলে জিজ্ঞাসা করলাম, এই যে এক নদীর সাথে দূরান্তের আর এক নদীকে জুড়ে দেবার কথা হচ্ছে, সে বিষয়ে তাঁর কি মত? প্রবীণ মানুষটি ভাবলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন—এ যদি ঠিক হতো, ভগবান আগে থেকেই তা করে রাখতো। প্রসঙ্গত বলে রাখি সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত এই মানুষটির কাছে প্রকৃতিই ভগবান—নদী, জঙ্গল, পাহাড়, প্রান্তর, তাঁরই রূপের প্রকার ভেদ। তাঁর এই সরল উক্তি শুনে আমি বড় বিস্ময়ে আলোড়িত হলাম। কি গভীর উপলব্ধির কথা তিনি বললেন! এতো ইকোলজি বা ইকোসিস্টেমের একেবারে গোড়ার কথা—"Nature knows the best." প্রাথমিক বিস্ময়ের ধাক্কা সামলে উঠে অতঃপর এক ধরনের অপরাধ বোধে দহিত হলাম। আমার সামনের এই মানুষটি হলেন সেই চির অবহেলিত, বঞ্চিত ও ব্রাত্য ভারতবর্ষের মানুষদের এক প্রতিভূ, এলিট্ ইন্ডিয়া যার প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও স্বাভাবিক প্রকৃতি-বোধকে কোন মূল্য দেয় না। সেদিনের সেই আলো-আঁধারি সন্ধ্যায় উপেক্ষিত এই প্রাজ্ঞ মানুষটির সামনে দাঁড়াতে লজ্জা আর গ্লানিতে মাথা আমার হেঁট হয়ে গেল।

জারুলিয়া গ্রামের এক মাটির বাড়ির সদ্য লেপা দেওয়াল দেখি এক প্রবীণ মানুষ তাঁর নাতি -নাতনিদের নিয়ে মহা উৎসাহে চিত্র-বিচিত্র করে তুলছেন। দাঁড়াতেই হল। মাটি বা পাথর পিষে তৈরি গাঢ় লাল, বাদামী, আকাশি, নীল, সাদা—নানা রঙের সমন্বয়ে এমনিতেই আদিবাসী সাঁওতালরা তাঁদের ঘর-গৃহস্থালি প্রসন্ন করে তোলেন। বীরেন বাস্কে মশাই দেখছি, রঙ্গীন দেওয়ালের প্রেক্ষাপটে নানা রকমের জীবজন্তু, পাখি, গাছ-গাছালির ছবি আঁকছেন গভীর মমত্বে। জিজ্ঞাসা করলাম, এ সব ছবি তিনি কেন আঁকছেন? হাতে নিয়ে তুলি (পাটের তৈরি), পাত্রে (মাটির খুড়ি) নিয়ে প্রবীণ মানুষটি বললেন—এককালে এই অঞ্চলে চিত্রিত পশু-পাখিরা সব ছিল; গভীর জঙ্গল ছিল, বাঘ-ও ছিল। তারা যে ছিল, নাতি-নাতনিদের সে কথা সব সময় বলি। এরা তো এইসব জীবজন্তু দেখে নি কখনও, তাই চিনিয়ে দিচ্ছি। লোকজনকেও বলছি— আমাদের কত কিছু সম্পদ ছিল। তুলির বলিষ্ঠ আঁচড়ে এক এক করে ফুটে উঠছে ভালুক, বাঘ, গুলে বাঘ, হুরার, মাণিকজোর, সরাল—কত কি! তন্ময় বাস্কে মশাই এঁকেই চলেন, অধোবদনে আবার পথ ধরি।

ঝাড়গ্রামের যে স্কুলটির সঙ্গে আমি পরিচালনার কাজে যুক্ত, তার বার্ষিক অনুষ্ঠান হয় ডিসেম্বর মাসের শেষ চার দিন ধরে। মূলত আদিবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল। সেবার ভাবলাম sit and draw গোছের ছবি আঁকার একটা অনুষ্ঠান করি। কলকাতার দুজন নামী শিল্পী এ কাজে সহায়তা করতে রাজি হলেন। নির্দিষ্ট দিনে স্কুলের মাঠে সাদা কাগজে ছেলে মেয়েরা যে যার খুশি ছবি আঁকছে ভারি আগ্রহে; শিল্পীরা তার তদারক করছেন। এক শিল্পী আদিবাসী এক ছেলের আঁকা ছবি দেখে বললেন—'এখানে একটা প্রজাপতি আঁকো।' ভ্রূক্ষেপ না করে ছেলেটি বললো—'এখানে প্রজাপতি হয় না।' শিল্পী একটু থতোমতো হয়েছিলেন, পরে এসে আমাকে বললেন—'দাদা, ছেলেটি ঠিকই বলেছে; ভেবে দেখলাম ঐ ছবিতে প্রজাপতি বাহুল্য ও প্রক্ষিপ্ত হতো।' শান্তিনিকেতনের কলাভবনের নামকরা সেই শিল্পী আরোও বললেন, 'দেখুন কি গভীর এদের প্রত্যয় আর অন্তর্দৃষ্টি, অথচ এরা কেউ ছবি আঁকা শেখে নি!' আদিবাসী, বিশেষ করে সাঁওতাল সম্প্রদায়দের মধ্যে যে জন্মগত শিল্পী সত্তা আছে, আমরা ক'জন তার খবর রাখি বা শ্রদ্ধার চোখে দেখি? মাথা হেঁট তো হবেই!

ঝাড়গ্রামের যে এন জি ও টির সঙ্গে আমি যুক্ত, এক সময় তাদের একটি গ্রামীণ ব্যাঙ্ক প্রকল্প ছিল। মূলত আদিবাসীদের জন্যই। গ্রাম-গ্রামান্তরে কোনও ব্যাঙ্ক নেই, শহরে এসে জামিনদার নিয়ে যে অ্যাকাউন্ট খুলবে, তারও উপায় নেই। ফলে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পাবার কোনও সুযোগ এদের ঘটে না। গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীরা তাই বিভিন্ন গ্রামে পর্যায়ক্রমে হাজির হতেন ঋণ দিতে বা তা শোধ নিতে। তেমনি একটি ঋণ মেলায় গিয়েছি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে না হতে এক এক করে আদিবাসী মহিলা সদস্যরা আসতে শুরু করলেন। তাঁদের নাম যাই হোক, চেহারা সবার প্রায় এক—জীর্ণ, শীর্ণ, ক্লান্ত,

অপুষ্ট ও হতদরিদ্র—পরনের বহুব্যবহৃত ধূসর শাড়িটির মতই। তবু খাতা খুলে নাম মেলাতে হয়, টিপছাপ নিতে হয়। সেই কাজ করতে করতে লক্ষ্য করলাম, এদের অনেকে যে ঋণ শোধ দিচ্ছেন তার পরিমাণ : তিন টাকা বারো আনা, চার টাকা চার আনা, সাড়ে পাঁচ টাকা, ছ' টাকা ইত্যাদি।

টাকার সঙ্গে ভগ্নাংশ ঐ পয়সা কেন জমা দিচ্ছেন এরা, জানতে চাইলাম এক পুরোনো সহকর্মীর কাছে। তিনি জানালেন, শালপাতা বিক্রি করে ওরা সেদিন যে পয়সা পেয়েছেন, তা থেকে দু-একদিনের ন্যূনতম উপাদান—যেমন দু-এক কিলো মোটা চাল, একটু কেরোসিন বা সর্ষের তেল, সামান্য লবন কিনে যা বেচেছে তার পুরোটাই জমা দিয়ে যাচ্ছেন ঋণ উশুল করতে। হাতে উদ্বৃত্ত কিছু পয়সা থাকলে, মরদ সবটুকু কেড়ে নিয়ে ভাটিখানায় ছুটবে; তাই চার আনা পয়সাও তারা কৃপণের ধনের মতো আগলে রেখে ঋণ শোধ করবেন। অনেক দিন পর অনুভব করলাম চার আনা পয়সার দাম! অবস্থাভেদে চার আনাও কত দামি হয়ে ওঠে! কিন্তু শুধুমাত্র চার আনার মাহাত্ম্য শোনাতে এ কাহিনী নয়। একটু আগে ঐ যে সাংসারিক ন্যূনতম সওদার কথা বললাম, তাতে আর একটি ক্রীত বস্তুর কথা বলি নি ইচ্ছে করেই। সওদার তালিকায় আরো আছে—দেশলাই, না বাক্স নয়, দেশলাই কাঠি! একটি পুরো দেশলাই কেনার স্বচ্ছলতা ওদের নেই। তিন চারজনে এক বাক্স দেশলাই কিনে তার কাঠি ওরা ভাগ করে নেয়, বাক্সটির, মানে খোলটির, মালিক পর্যায়ক্রমে পাল্টায়। স্বাধীনতার ৬০ বছর অতিক্রান্ত, বাড়িতে এক বাক্স দেশলাই-এর সংস্থান নেই আঁধার-মাণিক আদিবাসীদের ঘরে। মাথা হেঁট হয়ে যায়, হয়েই থাকে। এক ভারতবর্ষে থাকে এরা, আর এক ইন্ডিয়াতে আমরা। 'INDIA, that is NOT Bharat'—সংবিধানের প্রথম বাক্যটি এইভাবেই সংশোধন করতে হবে।

**উমা**

# গার্ডনার অভ বিলিফস

**ভিটল সি নাদকার্নি**

'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত মজাদার অঙ্কের কলামের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল মার্টিন গার্ডনার। সেই গার্ডনারের সম্প্রতি জীবনাবসান হয়েছে ৯৫ বছর বয়সে। অঙ্কের জন্য পরিচিত হলেও তাঁর সাহিত্য কীর্তিও উল্লেখ করার মতো, উপন্যাস ছাড়াও দর্শন, পদার্থজ্ঞান, ধর্ম আর জাদুবিদ্যা নিয়ে বহু বই লিখেছেন। অপবিজ্ঞানের মুখোশ খোলার কাজে তাঁর বিপুল খ্যাতি হলেও প্রাক্ যৌবনে তিনি ছিলেন খ্রিস্টান মৌলবাদে বিশ্বাসী।

পরবর্তী জীবনে তাঁর 'পশ্চাদপসরণ' অথবা ঈশ্বর বিশ্বাসের ব্যাখ্যা হয়তো এর মধ্যেই নিহিত। যাঁরা তাঁকে নির্ভেজাল সন্দেহবাদী হিসেবে জানতেন, তাঁদের কাছে তাঁর এই ঈশ্বর বিশ্বাস ছিল এক গভীর আঘাত। কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল যথেষ্ট খ্যাপামি, যা তাঁকে সব কিছুকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যাকারী হয়ে উঠতে দেয়নি। এই খ্যাপামির উদাহরণ? তিনি ছিলেন একাধারে ল্যুইস ক্যারলের লেখা 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' গ্রন্থের বিশ্ববন্দিত বিশেষজ্ঞ, একজন ভোজবাজির এবং শখের জাদুকর।

তিনি বলেছিলেন তাঁর ধর্মবিশ্বাস ছিল 'ইচ্ছার আবেগমথিত রূপান্তর', আর এই বিশ্বাসের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য অথবা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। আরো বলেছিলেন, তিনি নাস্তিকও নন, অজ্ঞেয়বাদীও নন। তার বদলে নিজেকে বর্ণনা করেছেন এক দার্শনিক ঈশ্বরবিশ্বাসী রূপে—প্লেটো আর কান্টের মতো আরো অনেকের উত্তরসূরী হিসেবে।

সংগঠিত ধর্মমতের সমালোচক হলেও তিনি ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। সেটা এজন্য নয় যে ঈশ্বর রহস্যজনকভাবে অলৌকিক সব ঘটনা ঘটান অথবা মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে চলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রার্থনা আর ধর্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ হাসিখুশি থেকে জীবন কাটাতে পারে।

পরলোকে তাঁর বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তা নিয়ে তিনি কখনো জল্পনা-কল্পনা চালাননি। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'এটা করা মানে ঈশ্বরের চরিত্র নিয়ে কল্পনা করা'। 'এর অস্তিত্ব নিহিত রয়েছে এক আধিদৈবিক জগতে। আশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে এটা এমন একটা বিশ্বাসের জন্ম দেয় যে এরকম এক জগৎ থাকার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেটা সম্পর্কে কেউ কিছুই বলতে পারে না কারণ কেউই সে সম্পর্কে কিছু জানে না'। অর্থাৎ তাঁর দার্শনিক ঈশ্বরবাদ ছিল সম্পূর্ণরূপে আবেগজনিত। তিনি এর তুলনা করেছেন কান্টের দর্শনের সঙ্গে, যিনি 'ধর্মবিশ্বাস টিকিয়ে রাখার জন্য বিশুদ্ধ যুক্তিকে ধ্বংস করেছিলেন।'। ব্রাহ্মণের 'নেতি নেতি' ধারণার যাঁরা প্রবক্তা ছিলেন, সেই বেদান্তবাদীদের সঙ্গে তাঁর এই ধারণার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

এরকম ধারনার পোষক হয়েও তিনি কিন্তু খ্যাতনামা পদার্থজ্ঞানী ডেভিড ব্যোমের 'প্যানসাইকিয়াজম' সহ সকল আগেবতাড়িত ধ্যানধারণাকে উপহাস করতে পিছু হটেননি। ব্যোমের বিশ্বাস ছিল, সকল পদার্থই কোনো না কোনো ভাবে নিম্নমাত্রার চেতনা নিয়ে সজীব।

কিন্তু তিনি ছিলেন মুক্তমনা মানুষ। তিনি এটাও জোর গলায় বলেছিলেন যে ব্যোমের 'পাইলট ওয়েভ' তত্ত্বের কার্যকারিতার সম্ভাবনাকে তাঁর প্রাচ্যদেশীয় আধ্যাত্মবাদী বিশ্বাসের জন্য মোটেই খাটো করে দেখা উচিত নয়, ঠিক যেমন বাইবেলে বর্ণিত কাহিনীতে বিশ্বাস এবং অপরসায়ন নিয়ে খ্যাপামির জন্য আইজ্যাক নিউটনের পদার্থ বিজ্ঞানে বিপুল অবদান কখনোই খাটো হয়ে যায় না।

**অনুবাদ : পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়**

ইকনমিক টাইমস, ১৭ জুন ২০১০

# হলুদ মঙ্গল কথা

উৎপল সান্যাল

বহুকাল থেকেই এদেশে হলুদ নানাভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে তা সে রান্নার উপকরণ হিসেবেই হোক বা কাঁচা খাওয়ার জন্য, নানান রোগের চিকিৎসায়, পূজায় ও শুভ অনুষ্ঠানে, আয়ুর্বেদে, প্রসাধন ও রূপচর্চায়। জানা গেছে যে আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে হরপ্পা সভ্যতায় হলুদ ব্যবহৃত হত, হলুদকে সংস্কৃতে হরিদ্রা বলা হয়, হিন্দিতে হলদি আর ইংরেজিতে Turmeric। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে ও পুঁথিতে হরিদ্রার উল্লেখ আছে। সাম্প্রতিককালে গবেষণালব্ধ তথ্যে নানান রোগ প্রতিরোধে আর চিকিৎসায় এর বিশেষ ভূমিকা জানার পর সারা বিশ্বে আলোড়ন ফেলেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি চমৎকার রিভিউ প্রবন্ধে (তথ্যসূত্র ১) বলা হয়েছে যে ১৯৬৬ সালের পরে দু হাজার ছশোরও বেশি গবেষণাপত্র শুধুমাত্র ইংরেজিতে বেরিয়েছে যেখানে হলুদ এবং এর প্রধান উপকরণ কারকিউমিন (Curcumin) ওপর নানা কাজ করা হয়েছে। এর থেকেই হলুদের গুরুত্ব বোঝা যায়।

সারা পৃথিবীতে উৎপন্ন হলুদের ৮৫ শতাংশই ভারত থেকে পাওয়া যায়। এছাড়া দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশেও হলুদ চাষ করা হয়। তামিলনাড়ুর ইরোড (Erode) এবং সালেম অঞ্চলের হলুদ, মহারাষ্ট্রের সাংলি অঞ্চলের উৎপাদিত হলুদ বিশ্বখ্যাত। এছাড়া কেরালার আলেপ্পি হলুদ তার বিশেষ রং এবং গন্ধের জন্য খ্যাত। হলুদ গাছ মোটামুটিভাবে দু-তিন ফুট লম্বা হয় আর কমবেশি একবছর বাঁচে। মাটির নিচে যে কাণ্ড Rhizome থাকে তার থেকে হলুদ পাওয়া যায় যা দেখতে অনেকটা আদার মত। এটি Zingiberaceae ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত। এই রাইজোম থেকেই প্রতি বছর হলুদ গাছ উৎপন্ন হয়। হলুদের প্রায় তিরিশটি প্রজাতির কথা জানা আছে। সবথেকে সহজলভ্য সাধারণ হলুদের বোটানিক্যাল নাম হল Curcuma longa যা প্রায় ৯৫ শতাংশ উৎপাদিত হয়। কারকিউমিন নামক পলিফেনল রাসায়নিকটির জন্যই এর রঙ হলুদ। কারকিউমিন শতকরা ৫ ভাগ অবধি উপস্থিত থাকে। এর রাসায়নিক নাম হল (1E,6E) - 1,7-Bis (4-hydroy--3-methoyphenyl)-1,6-heptadiene-3, 5-dione। এর আণবিক গুরুত্ব হল 368.38 এবং রাসায়নিক সঙ্কেত $C_{21}H_{20}0_6$। হলুদে কারকিউমিন ছাড়া ৫ শতাংশ মতো এসেন্সিয়াল অয়েলস থাকে। কাঁচা হলুদকে জলের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ ফোটানোর পরে ড্রাই ওভেনে রেখে শুকানো হয়। এবং তারপর শক্ত হলুদের টুকরোকে পিষে গুঁড়ো হলুদ তৈরি হয় যার সঙ্গে আমরা সবাই বিশেষ পরিচিত।

১০০ গ্রাম হলুদের খাদ্যগুণ হিসেবে দেখা গেছে যে এতে জলীয় অংশ থাকে প্রায় ১৩.১ গ্রাম; প্রোটিন ৬.৩ গ্রাম; ফ্যাট ৫.১ গ্রাম; খনিজ পদার্থ ৩.৫ গ্রাম; ফাইবার ২.৬ গ্রাম; কার্বোহাইড্রেটস বা শর্করা জাতীয় বস্তু ৬৯.৪ গ্রাম। এর থেকে ৩৫০ কিলো ক্যালরি তাপশক্তি পাওয়া যায় (তথ্যসূত্র ২)। এছাড়া হলুদে ভিটামিন 'এ' ১৭৫ i.u, ভিটামিন বি১ ও বি২, ভিটামিন সি আছে। এছাড়াও ১৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২৮২ মিলিগ্রাম ফসফরাস ও ৬৮ মিলিগ্রাম আয়রন আছে।

**নানান রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় হলুদের ব্যবহার**

জনজীবনে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে (folk medicine) হলুদ জীবাণু প্রতিরোধক (অ্যান্টিসেপটিক) হিসেবে কাটা, পোড়ায়, আঘাতে ব্যবহৃত হয় হলুদের প্রদাহকারী (অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি) ক্ষমতা আছে। ফোড়া বা কার্বাঙ্কল ফাটাতে অনেক সময় এর পাশে হলুদের প্রলেপ দেওয়া ও কমপ্রেস করা হয়। হাত পা মচকে গেলে চুন হলুদের প্রলেপ ফোলা ও ব্যথা বেদনা কমাতে সাহায্য করে---এ অভিজ্ঞতা বহুদিনের। লিভারের গণ্ডগোল, পেট ফাঁপায় ও হজমের সমস্যায়, চর্মরোগের চিকিৎসায় হলুদ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। জলবসন্তে মামড়ি শুকোনোর জন্য নিমহলুদ লাগানোর প্রথা আছে। যেহেতু হলুদের ব্যথা কমানোর ক্ষমতা আছে তাই বাতে বা অস্টিও আর্থারাইটিসের যন্ত্রণা কমাতে হলুদকে কাজে লাগানো হয়। হলুদে উপস্থিত কারকিউমিনকে এইসব গুণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। কারকিউমিনের অ্যান্টি-ডায়াবেটিক ও অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল ক্ষমতার কথাও জানা গেছে। অ্যালজাইমার রোগ আটকাতে এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতে এর বিশেষ উপযোগী ভূমিকা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। হলুদের atherosclerosis প্রতিরোধ ক্ষমতাও জানা গেছে। এই রোগে ধমনীর দেওয়ালে নানা কারণে অধঃক্ষেপ বা plaque জমা হওয়ার ফলে ধমনীর রক্তবহন ক্ষমতা কমে যায়। ফলে হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোক হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

হলুদ কোলেস্টেরল লেভেলকে কমাতে সাহায্য করে এবং শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর লো ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন কোলেস্টেরলের (LDL) জারণে বাধা দেয়। সেহেতু জারিত LDL ধমনীতে 'প্লেক' গঠনে সাহায্য করে, তাই এই বাধাপ্রাপ্তির ফলে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক হওয়ার ঝুঁকি কমে। কোন কোন স্ত্রীরোগের চিকিৎসাতে হলুদের ব্যবহার হয়।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় হলুদের পিত্তনাশক, শক্তিবর্ধক জীবাণুনাশক, রক্তশোধক, দাহনিবারক ইত্যাদি গুণ চিহ্নিত হয়েছে। কারকিউমিনের আর একটি বিশেষ গুণ হল শরীরে রোগপ্রতিরোধকারী ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা (Immunomodulatory effect)। দুধে হলুদ মিশিয়ে খাওয়া হয় শরীরের অনাক্রমতা বা ইমিউনিটি বাড়িয়ে তুলতে। আদা দেওয়া চা যেমন খাওয়া হয় সেরকম হলুদযুক্ত চা পান করা বিশ্বে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। জাপানের কোথাও কোথাও বেশ কিছু বছর ধরে এই রকম চা খাওয়া চলে আসছে।

**ক্যান্সার প্রতিরোধ ও চিকিৎসায় হলুদ**

কয়েক দশক ধরে ক্যান্সার প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ পদার্থের (phytochemicals) উপকারিতা নিয়ে কাজ চলছে। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত কিছু পলিফেনল এর মধ্যে পড়ে যেগুলি বাদাম জাতীয় শস্যদানায়, সবুজ বা সাধারণ কালো চায়ে, অলিভ তেলে এবং বিভিন্ন মশলায় যেমন হলুদে উপস্থিত আছে। সাধারণ সুস্থ কোষের তুলনায় দুষ্ট ক্যান্সার কোষগুলির বৃদ্ধি দ্রুত, অনিয়ন্ত্রিত, অস্বাভাবিক এবং ক্যান্সার কোষগুলি উপযুক্ত সময়ে মৃত্যুবরণ করতে (apoptosis) ভুলে যায়। ক্রোমোজোমের পরিবর্তনে (translocation & mutation) অথবা অন্যান্য জেনেটিক পরিবর্তনে শরীরে বহু ক্যান্সার উৎপন্ন হয়। দেখা গেছে কারকিউমিন কোষ বৃদ্ধি সংক্রান্ত regulatory mechanism এর ওপরে কাজ করে এবং apoptosis বাড়াতে সাহায্য করে, এক কথায় ক্যান্সার কোষকে মৃত্যুবরণ করতে প্ররোচিত করে। দেহে উপস্থিত ক্যান্সার সৃষ্টিকারী অঙ্কোজিনের (oncogene) সক্রিয় হওয়া ও টিউমার সাপ্রেসর জিনের যেমন p53 জিনের ইত্যাদির নিষ্ক্রিয়তার সঙ্গে ক্যান্সার সৃষ্টি হওয়ার সম্পর্ক নিগূঢ়। এক কথায় এই দু' ধরনের জিন গাড়ির অ্যাক্সিলারেটর ও ব্রেকের মতো কাজ করে। অঙ্কোজিন ক্যান্সার কোষের বাড়বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং অন্যদিকে গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার মতই p53, bax ইত্যাদি জিন কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। কারকিউমিন অঙ্কোজিনকে নিষ্ক্রিয় করে অন্যদিকে p53 জিনকে উজ্জীবিত করে (তথ্যসূত্র ১)। ক্যান্সার কোষগুলি বাঁচার জন্য নিকটবর্তী রক্তবাহী নালির থেকে নতুন নতুন সূক্ষ্ম নালির সৃষ্টি করে যে পদ্ধতিকে angiogenesis বলা হয়। ভ্যাসকুলার এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর (VEGF) এই প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। কারকিউমিন এই angiogenesis এ বাধা দেয় ফলে এই সূক্ষ্ম নালি সৃষ্টি হয় না এবং উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে ক্যান্সার কোষগুলি ধ্বংস হয়।

কারকিউমিনের কেমোপ্রিভেন্টিভ ও অ্যান্টি অক্সিডান্ট ধর্মও আছে। এ প্রসঙ্গে জানা যেতে পারে যে অক্সিড্যান্ট বলতে কি বোঝায়। আমরা সকলেই জানি যে অক্সিজেন আমাদের জীবন ধারণের জন্য অপহার্য কিন্তু সেই অক্সিজেনই কোষের অবিরাম জটিল বিপাকক্রিয়ার ফলে নানারকম ক্ষতিকর অত্যন্ত সক্রিয় মূলক ও পদার্থ তৈরি করে যাদের reactive oxygen species (ROS) বা অক্সিড্যান্টস বলা হয়। কিছু উদাহরণ হল সুপার অক্সাইড anion মূলক ($.0_2^-$), সিঙ্গলেট অক্সিজেন ($.0_2$) হাইড্রক্সিল র‍্যাডিক্যাল (HO.) ইত্যাদি। এগুলি অত্যন্ত অস্থায়ী এবং মাইক্রোসেকেন্ডে ($10^{-6}$ sec) এদের আয়ুষ্কাল মাপা হয়। কোন কোন উৎসেচক যেমন জ্যানথিন অক্সিডেজ (xanthine oxidase) সুপার অক্সাইড anion মূলক তৈরির জন্য দায়ী। হাইড্রক্সিল র‍্যাডিকাল সব থেকে বেশি ক্ষতিকারক বলে মনে করা হয়। এরা কাছাকাছি যে কোনো অণুকে আঘাত হানে যাতে তার থেকে ইলেকট্রন পেয়ে এরা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে। এর ফলে নতুন নতুন মুক্ত মূলক (ফ্রি র‍্যাডিক্যাল) সৃষ্ট হয় ও শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু হয়ে যায় ফলে DNA-তে উপস্থিত বিভিন্ন উপাদানের রাসায়নিক পরিবর্তন হতে পারে। ক্যান্সার সৃষ্টির অন্যতম কারণ হল কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত DNA এর ক্ষতি এবং সেই ক্ষতি না সারানোর অপারগতা বা অক্ষমতা। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত DNA নানাভাবে ভুল সঙ্কেত পাঠাতে থাকে যার ফলে কোষবৃদ্ধি অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে যার পরিণামে ক্যান্সার উৎপন্ন হতে পারে। হাইড্রক্সিল র‍্যাডিক্যাল কোষপ্রাচীরে উপস্থিত লিপিডকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রতি মুহূর্তে তৈরি হওয়া এই সব মুক্ত মূলক কিভাবে ক্যান্সার তৈরি হতে সাহায্য করে। অন্যদিকে শরীরে উপস্থিত কিছু উৎসেচক স্বতঃস্ফূর্তভাবে অতিরিক্ত বিভিন্ন মুক্ত মূলককে নিষ্ক্রিয় করে। এদের সঙ্গে 'কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে' যুদ্ধ করার মতই এই সব অ্যান্টি অক্সিড্যান্টস বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে যার অন্যতম হল কারকিউমিন।

**"অক্সিজেন আমাদের জীবন ধারণের জন্য অপহার্য কিন্তু সেই অক্সিজেনই কোষের অবিরাম জটিল বিপাকক্রিয়ার ফলে নানারকম ক্ষতিকর অত্যন্ত সক্রিয় মূলক ও পদার্থ তৈরি করে যাদের reactive oxygen species (ROS) বা অক্সিড্যান্টস বলা হয়। কিছু উদাহরণ হল সুপার অক্সাইড anion মূলক ($.0_2^-$), সিঙ্গলেট অক্সিজেন ($.0_2$) হাইড্রক্সিল র‍্যাডিক্যাল (HO.) ইত্যাদি। এগুলি অত্যন্ত অস্থায়ী এবং মাইক্রোসেকেন্ডে ($10^{-6}$ sec) এদের আয়ুষ্কাল মাপা হয়।"**

**ক্যান্সার চিকিৎসায় কারকিউমিন**

গবেষণাগারে কারকিউমিনের সঙ্গে নানান প্রতিষ্ঠিত ক্যান্সারের ওষুধ মিশিয়ে মানুষের বিভিন্ন ক্যান্সার কোষের ওপরে প্রয়োগ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে মানুষের MCF - 7 ব্রেস্ট ক্যান্সার কোষে Genistein নামে একটি ওষুধ ও কারকিউমিন আলাদা আলাদা প্রয়োগ করে যতটুকু কার্যকর হয়েছে তার থেকে অনেক বেশি ফল (synergistic effect) পাওয়া গেছে এদের একত্র প্রয়োগে। একই ভাবে মানুষের কোলন ক্যান্সার কোষের ওপর 5 - FU র সঙ্গে কারকিউমিনের একত্রে প্রয়োগ অনেক বেশি কার্যকর হয়। বর্তমানে ক্যান্সার রোগীর ওপর সরাসরি কারকিউমিনের প্রয়োগের গুণাগুণ বিচার করা হচ্ছে যাতে এর ভূমিকা সম্বন্ধে আরো নিশ্চিত জানা যায়।

**কতটা নিরাপদ?**

দেখা যাক কারকিউমিন তথা হলুদ খাওয়া কতটা নিরাপদ। সাধারণভাবে হলুদ খাওয়াকে আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ফুড এবং ড্রাগ অথরিটি (FDA) নিরাপদ বলেছে। দৈনিক প্রতি কেজি শরীরের ওজনে 0.1থেকে 3 মিলিগ্রাম পর্যন্ত কারকিউমিনের শরীরে প্রবেশ FAO ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি নিরাপদ সীমা হিসেবে বলেছে। দেখা গেছে ভারতে দৈনিক দুই থেকে আড়াই গ্রাম অবধি হলুদ প্রতিদিন খাওয়া হয় যাতে কারকিউমিন ৬০-১০০ মিলিগ্রাম থাকতে পারে। জনজীবনে এর সেরকম কোন বিষক্রিয়া নজরে পড়ে নি। (তথ্যসূত্র ১) একটি বিশেষ পরীক্ষায় দৈনিক ১.২ থেকে ২.১ গ্রাম কারকিউমিন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস রোগীদের ২ থেকে ৬ সপ্তাহ খাওয়ানো হয়েছিল কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই। অন্য একটি পরীক্ষায় কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের ৩.৬ গ্রাম অবধি কারকিউমিন চার মাস পর্যন্ত খাওয়ানো হয়েছিল রোগীরা তা সহ্য করতে পেরেছিলেন। তবে এটিও মনে রাখা দরকার অল্প কিছু ক্ষেত্রে কারকিউমিনের সরাসরি সংস্পর্শে অ্যালার্জিঘটিত ডার্মাইটিস দেখা গেছে। সব দিক বিচার করে বিশ্বে সাধারণভাবে দৈনিক অল্প পরিমাণে কাঁচা হলুদ (১- ১.৫ গ্রাম) খেতে বলা হয় ক্যান্সার রোগ প্রতিরোধের জন্য। এই কাঁচা হলুদ চিবিয়ে বা বেঁটে খাওয়া যেতে পারে। যাঁদের অ্যাসিডিটির প্রবণতা আছে তাঁরা কিছু খাওয়ার পর হলুদ খেতে পারেন। (তথ্যসূত্র ৩)

**রান্নার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার**

আগেকার দিনে বাজার থেকে কাঁচা হলুদ কিনে শিলে বেঁটে রান্নায় ব্যবহার করার প্রচলন ছিল। কিন্তু আজকের কর্মব্যস্ততার যুগে এবং অন্যান্য কারণে তা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। তাই প্যাকেটের হলুদ গুঁড়োই এখন মূলত ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই নামী কোম্পানির প্যাকেট দেখে কিনতে হবে কারণ

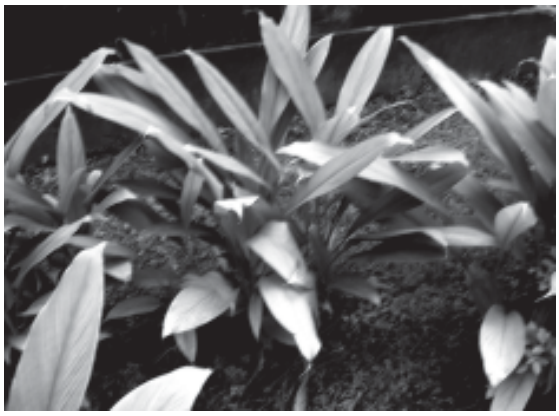

লেবেলহীন সস্তার হলুদ গুঁড়োয় দুটি বিপজ্জনক রাসায়নিক যেমন লেড ক্রোমেট বা মেটানিল ইয়েলো মেশানো থাকতে পারে। এদের হলুদ রঙের জন্য এরা ভেজাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বহু রান্নায় স্বাদগন্ধ আনতে হলুদের ব্যবহার ব্যাপক। আচারে, ঝোলে, ঝালে, অম্বলে এর প্রায় সর্বত্রই অবাধ বিচরণ বিশিষ্ট সুগন্ধের জন্য। কাঁচা হলুদের স্বাদ কিছুটা ঝালঝাল ও কষায়। হলুদের খাদ্য সংরক্ষণ ভূমিকার কথাও অনস্বীকার্য। তাই অনেক সময় মাছ মাংস ভালো করে ধুয়ে হলুদ ও লবণ মাখিয়ে ফ্রিজে ৩/৪ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করে দেখা গেছে যে সেগুলি খাদ্য উপযোগী আছে। ভারতের কোথাও কোথাও শাক কেনার পর হলুদ জলে ভিজিয়ে রেখে জীবাণুমুক্ত করা হয়। স্বাভাবিক pH এ বা আল্লিক দ্রবণে হলুদের রঙের পরিবর্তন হয় না, ক্ষারীয় দ্রবণে এটি লালচে বাদামি হয়।

**অন্যান্য ব্যবহার**

প্রসাধন দ্রব্য হিসেবে এবং রূপচর্চাতেও হলুদের বিশেষ ব্যবহার স্বীকৃত। চামড়ার ঔজ্জ্বল্য বাড়াতে, সতেজ ভাব রাখতে এবং চামড়াকে টানটান রাখতে হলুদ মাখা হয়। হলুদ জলে স্নান করার রীতিও কোথাও কোথাও আছে। বিয়ের সময় মাঙ্গলিক গায়ে হলুদের কথা তো সবারই জানা। এছাড়া হলুদ নানান পূজাপার্বণে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত পোঙ্গল উৎসবে একটি আস্ত হলুদ গাছ অর্চনা করা হয়। সব মিলিয়ে বলা যায় শুধু মাঙ্গলিক প্রতীক হিসেবেই নয়, বাস্তব জীবনেও হলুদ বিভিন্ন ভাবে আমাদের মঙ্গল করে চলেছে।

**তথ্যসূত্র:**

(১) Dr. Gourisankar Sa et al. 'Curcumin: From Exotic Spice to Modern Anti Cancer Drug.' Al Ameen J. Med. Sci. 3 (1), 21-37, 2010

(২) http: // www. turmeric.co.in

(৩) এই লেখকের নিবন্ধ : উৎস মানুষ, পৃষ্ঠা ২০, জুলাই ২০০৯ এছাড়া বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে লব্ধ তথ্যের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। **উ মা**

# রোগের ভয়ের ব্যবসা

**ভবানীপ্রসাদ সাহু**

সোয়াইন ফ্লু, বার্ড ফ্লু, সার্স—এ সব বিজাতীয় শব্দের সঙ্গে এখন এদেশের মানুষ যথেষ্ট পরিচিত। এগুলি যে 'ভয়াবহ' কিছু রোগের নাম, তাও এখন জানা। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেরই এটি জানা নেই যে, এই সব রোগের তথাকথিত ভয়াবহতা আসলে বেশির ভাগই ফোলানো ফাঁপানো এবং নিছক রোগের ভয় দেখিয়ে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করার ধান্দাবাজি।

মানুষকে রোগের ভয় দেখিয়ে মুনাফা লোটার নির্মম ব্যবসা ওষুধ ব্যবসায়ী তথা বিভিন্ন স্তরের চিকিৎসা ব্যবসায়ীরা যতটা পারে, অস্ত্র ব্যবসায়ীরাও মনে হয় তার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে না। বহু প্রাইভেট হাসপাতাল যেমন অপ্রয়োজনে ভেন্টিলেশান আর হাবিজাবি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়ে রোগীকে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতারণা করে, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহুজাতিক ওষুধ ও টিকা ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন রাষ্ট্রকে কোটি কোটি টাকার প্রতারণা করে—যা আসে সাধারণ মানুষের পকেট কেটেই। মুনাফার জন্য বলিপ্রদত্ত আধুনিক এই পুঁজিবাদী মানসিকতা ও বিশ্বায়নের নির্মম নিষ্ঠুর দিক হল ঐ রোগ—**আতঙ্কের ব্যবসা**।

যেমন ধরা যাক ২০০৯ সালে সোয়াইন ফ্লু-এর ব্যাপারটি। কি ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছিল তার স্মৃতি এখনো মলিন হওয়ার কথা নয়, কিন্তু কে-ই বা জানে যে একটি ওষুধ কোম্পানি এই আতঙ্ককে ভাঙিয়ে শুধু ভারতবর্ষ থেকেই কম পক্ষে দশ হাজার (১০০০০) কোটি টাকার মুনাফা করেছে। এছাড়া ঐ সময় সোয়াইন ফ্লু-এর তথাকথিত মুখোশ বিক্রি হয়েছিল কুড়ি লক্ষেরও বেশি। এবং এই ব্যবসার জন্যই ঐ সব বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিরা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থাকে কাজে লাগায়। আর বিপুল অর্থব্যয় করে এবং সরকারি পদস্থ ব্যক্তি ও সংবাদমাধ্যমকে টাকা খাইয়ে বশ করে ফেলে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এই প্রচারের জন্য তারা এক হাজার কোটি টাকার মতো আপাত বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করেছে, তবে তার বিনিময়ে তারা কিন্তু লাভ করেছে তার নয় গুণ অর্থাৎ শতকরা ৯০০ ভাগ। এই বশ করার ব্যাপারটা সূক্ষ্ম ও স্থূল নানাভাবেই হয়। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিজ্ঞানী আর আমলাকে যদি বিদেশ ভ্রমণের যাবতীয় খরচ, বিলাস বহুল হোটেলের খরচ বা মাত্র কয়েক কোটি দামের ফ্ল্যাট ও সুইস ব্যাঙ্কে সামান্য কয়েক কোটি টাকা দিয়ে দেওয়া হয়, তবেই তারা বিশেষ ঋতুকালীন ভাইরাস ঘটিত জ্বরের একটু বেশি প্রকোপকেই সোয়াইন ফ্লু বলে রায় দিতে থাকবে। দেশের কিছু সর্বাধিক বিক্রিত সংবাদপত্রকেও আরো কয়েক কোটি টাকা এবং বিশাল পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হলে তারাও একই সুরে কথা বলবে। তখন ছোট ছোট পত্রিকা এবং 'বিজ্ঞান পত্রিকা'গুলিও সরল বিশ্বাসে ঐ তালে তাল মেলাবে, বিশেষত যখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো সংস্থাই এই আতঙ্ক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ছড়ায়। সোয়াইন ফ্লু-এর ক্ষেত্রেও এমনই সব কাণ্ডকারখানা করা হয়েছিল।

এপ্রিল ২০০৯-এ মেক্সিকোতে প্রথম এই বিশেষভাবে পরিবর্তিত ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস (এইচ-১ এন-১) জনিত সোয়াইন ফ্লু দেখা দেয়। অতি দ্রুত তা ভারতসহ ১৬৮টি দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা আরো অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে মাত্র মাসখানেক সময়ে ২০০৯-এর ১১ই জুন রোগটিকে আন্তর্জাতিক মহামারী হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০৯-এর ১৩ই আগস্ট অব্দি সারা বিশ্বে ১৮২১৬৬ জন সোয়াইন ফ্লু-তে আক্রান্ত রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়, এর মধ্যে ১৭৯৯ জনের মৃত্যু হয় (শতকরা ১ ভাগেরও কম)। ভারতেও সেপ্টেম্বর ২০০৯-এর মধ্যে ৩৩৩ জনের এই রোগে মৃত্যু হয়েছিল বলে বলা হয়েছিল। পরবর্তী কালের (এপ্রিল ২০১০) একটি হিসেবে কয়েক লক্ষ আক্রান্ত ব্যধির মধ্যে বিশ্ব জুড়ে ১৮০০০ মৃত্যুর কথা বলা হয়েছিল।

ঐ সময় সোয়াইন ফ্লু নিয়ে কি ব্যাপক প্রচার, আতঙ্ক আর চূড়ান্ত সতর্কতা নেওয়া হয়েছিল তা অনেকেরই মনে থাকার কথা। কত সেমিনার, বিজ্ঞাপন, সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ। মুড়ি মুড়কির মতো 'মুখোশ' বিক্রি হচ্ছে। চড়া দামে রক্ত পরীক্ষা করা হচ্ছে। বিশেষ জায়গা থেকে বিক্রি হচ্ছে চড়া দামের ওষুধ এবং কেন্দ্রীয় সরকারই ঐ ওষুধ কোম্পানি থেকে কয়েক হাজার কোটি টাকার অ্যান্টি ভাইরাল ওষুধ কিনে মজুত করে রাখল যাতে প্রয়োজনে জনগণকে 'সাপ্লাই' করা যায়। (আসলে তা জনসাধারণেরই টাকায় এবং মাঝখান থেকে কমিশন খেল দু'চারজন ব্যক্তি, মুনাফা লুটল বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানি।)

কিন্তু আসল ব্যাপারগুলিকে চাপা দেওয়া হয়েছে। যেমন সোয়াইন ফ্লু এক বিশেষ ধরনের ফ্লু মাত্র, বড়জোর তা সাধারণ

ইনফ্লুয়েঞ্জার থেকে একটি বেশি তীব্র। এর থেকে মৃত্যুহার শতকরা এক ভাগেরও কম। ভারতে যারা মারা গেছিল বলে বলা হয়েছিল, তারা প্রায় সবাই অন্য জটিল রোগে ভুগছিল। এবং রোগটির শারীরিক আক্রমণ ও প্রসার ধীরে ধীরে আপনা থেকেই চলে যায়, গেছেও। শুধু লক্ষণগত চিকিৎসা, জল ও পুষ্টির জোগান ঠিক রাখা এবং ভিন্নতর জটিল রোগ থাকলে তার মোকাবিলা করাটাই প্রধান। দামি তথাকথিত ঐ অ্যান্টি ভাইরাল ওষুধের প্রকৃত ইতিবাচক ভূমিকাও বিতর্কিত এবং এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশ্বজুড়েই এর প্রকোপ ও প্রসারও প্রাকৃতিকভাবে ধীরে ধীরে কম হয়ে গেছে, যা এই ধরনের ভাইরাস জনিত রোগের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত। পরে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকেও স্বীকার করা হয়েছে যে, সোয়াইন ফ্লু-এর এই ভাইরাস (এইচ-১ এন-১) যাদের আক্রমণ করেছিল তাদের বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই তা ছিল মৃদু।

সব মিলিয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি সোয়াইন ফ্লু-কে আন্তর্জাতিক মহামারী হিসেবে ঘোষণা করা এবং আতঙ্ক ছড়ানোর ব্যাপারটি প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। বৃহৎ ঔষধ কোম্পানিগুলি থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাওয়ার জন্যই এ কাজ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জরুরি পরিষেবা দপ্তর (হু ইমার্জেন্সি কমিটি)-র সদস্যরা নোভাটিস, ক্যাডিলা ও বায়োসেন্ট-এর মতো বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলির বিক্রি (ও মুনাফা) দ্রুত বাড়ানোর জন্যই এই আতঙ্ক ছড়িয়েছে—এই অভিযোগে কাউন্সিল অব্ ইয়োরোপ অনুসন্ধান শুরু করেছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ঐ সব সদস্যদের অনেকেই এই সব ওষুধ কোম্পানিগুলির সঙ্গে কোন না কোন সময় যুক্ত ছিলেন। আমেরিকা ও ভারতের মতো দেশের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ও স্বচ্ছ তদন্তের অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ইনফ্লুয়েঞ্জা বিভাগের প্রধান, ডঃ কেইজি ফুকুদা কিছুদিন আগেই এ ক্ষেত্রে ওষুধ কোম্পানির প্রভাবের কথা অস্বীকার করে নিজেদের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্যের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এপ্রিল, ২০১০-এ তাঁর কথার সুর পাল্টে গেছে এবং মন্তব্য করেছেন, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষণার সীমাবদ্ধতা ('শর্ট কামিংস') ও বিভ্রান্তি ('কনফিউশন') ছিল এবং 'বাস্তবত ব্যাপারটিতে বিপুল পরিমাণ অনিশ্চয়তা ছিল। আমার মনে হয় আমরা এই অনিশ্চয়তার ব্যাপারটি অন্যদের বলি নি।' সারা পৃথিবীর বহু দেশ থেকেই এখন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দিকে শত শত অভিযোগের তীর ছুটে আসছে। আসলে যা ছিল অতি মৃদু এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ভবিষ্যদবাণীর তুলনায় অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি যেটিতে আক্রান্ত হয়েছে তাকে ঘিরে 'মিথ্যা আতঙ্ক' তৈরি করার জন্য বিশ্ব জুড়েই ক্রোধ সঞ্চারিত হয়েছে। কাউন্সিল অব ইয়োরোপ-এর পক্ষ থেকে স্ট্র্যাসবুর্গে এ জানুয়ারির ২৫ থেকে ২৯-এ অনুষ্ঠিত শুনানির শেষে, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসায়িক কারণেই সাধারণ ফ্লু-কে আন্তর্জাতিক মহামারীর তকমা পরানোর কাজটি করা হয়। ২০০৯-এর ১১ই জুন তা করা হয় এবং তার ফলে কয়েকটি ওষুধ কোম্পানি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বেশ কয়েক বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করতে সমর্থ হয়।

এইভাবেই বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সরকার, সরকারি-বেসরকারি প্রচারমাধ্যম এবং ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি দেশ জুড়ে একযোগে প্রবল আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু একই সঙ্গে তা ভুলিয়ে দিতে পেরেছিল যে, আমাদের দেশে প্রতিদিন গড়ে ১৫০০ মানুষ আন্ত্রিক সংক্রমণে মারা যায়, প্রতিদিন ১০০০ ভারতীয় মারা যায় যক্ষ্মা থেকে। প্রতি বছর ২০০০০ ভারতীয় মারা যায় 'জলাতঙ্ক' বা রেবিস থেকে এবং ১৫ থেকে ২০ হাজার মারা যায় সাপের কামড় থেকে। এছাড়া আছে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, অপুষ্টি, শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ইত্যাদি এবং অপুষ্টি। এগুলি স্থায়ী সমস্যা। মূলত গরীব মানুষরাই এসবে মারা যায়। সবচেয়ে বড় কথা এ সবগুলিই প্রতিরোধযোগ্য এবং চিকিৎসাযোগ্য (শুধু জলাতঙ্ক ছাড়া)। এদের পেছনে কিন্তু সরকারি উদ্যোগ বা প্রচারমাধ্যমের আন্তরিকতা নেই, যতটা ছিল বহুজাতিক ব্যবসায়ীদের স্বার্থপুষ্ট করার জন্য সোয়াইন ফ্লু নিয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করার মধ্যে।

প্রায় এই ধরনেরই কাজ কারবার করা হয়েছে ১৯৯৪ সালে প্লেগ নিয়ে। দীর্ঘদিন অস্তিত্বহীন এই রোগটির গুজব প্রথম শুরু হয় সেপ্টেম্বরে, গুজরাটের সুরাটে। বলা হয় ৫৬ জন মারা গেছে, শিগগিরই সারা ভারতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গ—নানা রাজ্যে ৬৭০০ জন ব্যক্তিকে প্লেগ সন্দেহে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে ৩৩৭ জনের মধ্যে নাকি প্লেগের জীবাণু পাওয়া গেছিল। অত্যন্ত সংগঠিতভাবে তখন আতঙ্ক ছড়ানোর কাজ করা হয়েছিল। কিন্তু কোথাও প্লেগ শুরু হলে তার আবশ্যিক লক্ষণ হচ্ছে আক্রান্ত ইঁদুরের মৃত্যু ও ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা (র‍্যাট ফল)। কিন্তু আদৌ এই ঘটনা তখন ঘটে নি, প্লেগ (নিউমোনিক প্লেগ) হওয়ার জন্য যে ধারাবাহিক পর্যায় থাকে তাও হয় নি। সব মিলিয়ে এটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, কিছু ব্যক্তি যথাসম্ভব উদ্দেশ্যমূলকভাবেই প্লেগের ঐ আতঙ্ক ছড়িয়েছিল। কলকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর মতো বিশেষজ্ঞ সংস্থা তার প্রতিবাদও জানায়। কিন্তু ব্যাপক প্রচার এবং মানুষের কাছে ঐ আতঙ্ককে 'খাওয়ানোর' সাফল্যে এই ধরনের প্রতিবাদ কোনও পাত্তা পায় নি। কিছুদিনের মধ্যেই প্লেগাতঙ্কের এই বেলুন ফুটো হয়ে যায়, 'প্লেগ' দূর হয়। কিন্তু মাঝখান থেকে প্লেগের কার্যকরী অ্যান্টিবায়োটিক ডক্সিসাইক্লিন কোটি কোটি টাকার বিক্রি হয়ে যায়। এবং যথার্থভাবেই কোনো কোনো বিজ্ঞানী ও

চিকিৎসক মহল থেকে সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে, গুদামে পড়ে থাকা অবিক্রিত বিপুল পরিমাণ ডক্সিসাইক্লিন দ্রুত বিক্রি করে লাভ ওঠানোর জন্যই এই ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছিল।

২০০৩ সালে আরেকটি রোগের বিপুল আতঙ্ক ছড়ানো হয়েছিল বিশ্ব জুড়ে। সে ছিল ভাইরাস ঘটিত 'সার্স' (সিভিয়ার অ্যাকিউট রেস্পিরেটরি সিন্ড্রোম)। যথাসম্ভব রোগটি শুরু হয় দক্ষিণ চীনে, নভেম্বরে, ২০০২ সালে। কিন্তু তার সামান্য প্রাদুর্ভাবকেই বিশাল করে দেখানো হল। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকেও বলে দেওয়া হল, শিগগিরই এটি সারা বিশ্বে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে। প্রচার মাধ্যমও ঝাঁপিয়ে পড়ল, বহু শত কোটি টাকার অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ বিক্রি হয়ে গেল। প্রায় জোর করে প্রচার করার চেষ্টা হল যে, ভারতেও রোগটি ঢুকে গেছে। কিন্তু ভারতে মাত্র ২০ জন রোগিকে সন্দেহজনক 'সার্স' আক্রান্ত বলে চিহ্নিত করা গেল। এদের মধ্যে মাত্র একজনের মধ্যে সার্স ভাইরাস পাওয়া গেল এবং ঐ ব্যক্তিও শেষ অব্দি সুস্থ হয়ে যায়। বিশ্বজুড়ে লক্ষাধিক সার্স মৃত্যুর ভবিষ্যদবাণী করা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মূল্যায়ন মিথ্যা প্রমাণ করে, মাত্র ২৫টি দেশে এ রোগের কিছুটা প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, মারা যায় মাত্র ৩০০ জন। সার্স-ও হঠাৎ করেই মিলিয়ে গেল। মাঝখান থেকে বিক্রি করে গেল কোটি কোটি টাকার ওষুধ। এতে কয়েকটি ওষুধ কোম্পানির মুনাফা বাড়ল, কিন্তু মার খেল নানা দেশের অর্থনীতি। উদাহরণ হিসেবে ভারতের শুধুমাত্র পর্যটন ক্ষেত্রে ঐ সময় ১৫০০ কোটি টাকার ক্ষতির কথা উল্লেখ করা যায়। কিছু কিছু মহল তাই এই মত পোষণ করেন যে, মুষ্টিমেয় কিছু কায়েমি স্বার্থের কলকাঠি নাড়ার ফলেই ঐ আতঙ্ক ছড়ায়, যার উদ্দেশ্য ছিল প্রায় সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনে অত্যন্ত দামি অ্যান্টিভাইরাল ওষুধটি অতি দ্রুত বিক্রি করা।

কয়েক বছর পরে এইভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছিল বার্ড ফ্লু নিয়েও। এটিও ভাইরাস ঘটিত (এইচ-৫ এন-১)। এটি মূলত পাখির রোগ। তবে তাকে ঘাঁটাঘাঁটি করলে বা তার অর্ধসিদ্ধ মাংস খেলে বিরল ক্ষেত্রে মানুষেও ভাইরাসটি ছড়াতে পারে। হংকং-এ ১৯৯৬ সালে এটি প্রথম চিহ্নিত হয়। ভারতে ২০০৬ সালে মহারাষ্ট্রে এটি শুরু হয় বলে বলা হয়েছিল। কিন্তু রোগটির বিপদ যত না, তার প্রচার হয় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অনেকগুণ বেশি করে। যেমন ইউ এন ও-র একটি সমীক্ষায় বলা হয় যে, আগামী কিছুদিনের মধ্যে সারা পৃথিবীতে ১৫ কোটি লোক বার্ড ফ্লু-তে মারা যাবে। কিন্তু শেষ অব্দি মাত্র ১৭০ জন ব্যক্তি আক্রান্ত হয় এবং মারা যায় ৯৩ জন। অর্থাৎ পাখির এই রোগটি স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ক্ষেত্রে অতি বিরল। তবু বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে প্রায় আদেশের মতই নির্দেশিকা জারি করা হয় যে, বিভিন্ন দেশ যেন বিশেষ কিছু ভাইরাস বিরোধী ওষুধ যথেষ্ট পরিমাণে কিনে মজুত করে রাখে, তাই করাও হল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কয়েক হাজার কোটি টাকার এই 'ওষুধ' বিশ্ব জুড়ে বিক্রি হয়ে গেল। আর শুরু হল ব্যাপক মুরগি নিধন। কোটি কোটি মুরগি মেরে ফেলে দরিদ্র দেশগুলির স্বল্প পুঁজির স্বনির্ভর ব্যবসায়ীদের চরম বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হল। যারা এই মুরগি মারার কাজ করছে তাদের ঐ ওষুধটি খাওয়ানো হয়, রোগ প্রতিরোধের জন্য। কিন্তু শেষ অব্দি ভারতে একজন মানুষও বার্ড ফ্লু-তে আক্রান্ত হয় নি। তবু এ ক্ষেত্রেও কোটি কোটি টাকার ওষুধ বাধ্যতামূলকভাবে কিনে দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত করা হল। এমন কি টিকা নিয়েও (সোয়াইন ফ্লু-রও) 'গবেষণা' ও ব্যবসা চলল। বিভিন্ন মহল থেকে এমনও তথ্য প্রমাণ দেওয়া হয়েছে যে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সংশ্লিষ্ট বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিদের কয়েকজন সরাসরি ঐ ওষুধ কোম্পানি ও তথাকথিত গবেষণা সংস্থার সঙ্গে আর্থিকভাবে সংশ্লিষ্ট।

কয়েক বছর পরে, ২০০৯ সালে আবার ছড়ানো হল সোয়াইন ফ্লু আতঙ্ক। স্পষ্টত তিন চার বছর অন্তর ব্যবসায়িক মন্দা কাটাতে বহুজাতিক ব্যবসায়ীরা কিছু কিছু রোগকে ঘিরে বিভিন্ন দেশের সরকারি স্তরে ও জন মানসে প্রবল আতঙ্কের কৃত্রিম এক বাতাবরণ সৃষ্টি করছে। বিশেষত দরিদ্র দেশগুলির মানুষের উপর তার চাপ পড়ে অনেক বেশি, তারাই এই ব্যবসায়িক ধান্দাবাজির শিকার। এই ধারাবাহিকতায় হয়ত ২০১২-১৩য় আবার কোনো রোগকে ঘিরে গুজব, আতঙ্ক ও ব্যবসায়িক ষড়যন্ত্র আনতে যাচ্ছে।

এই ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা সহজ নয়, তবে করতে হবে আমাদের মত বিভিন্ন স্তরের সাধারণ মানুষকেই। বিশেষত যখন বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মত আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে শেষ কথা বলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হিসেবে একদা সম্মানিত সংগঠনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অঙ্গুলি হেলনে চলে, তবে লড়াইটা অনেক কঠিনই হয়ে ওঠে। পাশাপাশি এটিও স্পষ্ট বোঝা যায় যে, আমাদের মত দেশে স্বাধীনভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে সত্যকে জানার পরিকাঠামো নেই বা তাকে কাজে লাগানো হয় না; বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার কয়েকজন ব্যক্তি যা বলছে তাকেই ধ্রুবসত্য হিসেবে ধরে নিয়ে অন্ধভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া হয়। এ ক্ষেত্রে দেশীয় কিছু মন্ত্রী আমলার স্বার্থও জড়িত থাকে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে মানুষের স্বার্থকে প্রধান ও একমাত্র গুরুত্ব দেওয়ার মানসিকতাকে প্রতিষ্ঠা করার লড়াইটির গুরুত্বও এই ধরনের লাগাতার আতঙ্ক ছড়িয়ে মানুষকে প্রতারিত ও শোষণ করার ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

১) Dr. Amiya Kumar Hati; Everyman's Science; Aug-Sept, 09। ২) Sananda Sahoo (USA)। ৩) Talk Radio News Service; 2.2.10, 14.4.10 etc । ৪) Dere Spiegel (online edition); 12.3.10 । ৫) নবমানব (বীরভূম)

**একটি প্রতিবেদন**

# নাকালিতে যা দেখলাম

ঘটনাটা আজ থেকে ৫-৬ মাস আগের। দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত লক্ষ্মীকান্তপুর অঞ্চলের ঢোলা থানার নাকালি গ্রামে হঠাৎ এক দৈব পুকুরের কথা শোনা গেল। ঐ গ্রামের বাসিন্দা বলাই রাজ ক্যান্সারে আক্রান্ত হন, ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। হঠাৎ মা মনসার স্বপ্নাদেশ পেয়ে ঐ দৈব পুকুরে তিনবার স্নান করার পর নাকি তার রোগ ভালো হয়ে যায়। খবরটি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৈব পুকুরের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া হয়ে ওঠে। বিপুল সংখ্যক ভক্ত প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে রোগ মুক্তির আশায় ঐ পুকুরে স্নান করতে দূরদূরান্ত থেকে আসতে থাকেন। পুকুরকে কেন্দ্র করে জমজমাট মেলারও সূচনা হয়, কারণ স্নানের পর মা মনসা মন্দিরে (যা আজও পাকা হয়নি) পুজো দেওয়া এই দৈব চিকিৎসারই অন্তর্গত। মন্দিরে প্রণামীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়তে থাকে।

৫-৬ মাস বেশ ভালোই চলছিল, বিবাদ শুরু হল জমির মালিকানা নিয়ে। সরকারি মতে ঐ জমি সরকারের খাস জমি, কিন্তু রাজ পরিবারের মতে ঐ জমি তাদের। এই বিবাদের ফলে সরকারি তরফে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে একদল পুলিশ পুকুরের চারপাশে মোতায়েন করা হয়, যাতে কেউ এই পুকুরের কোনো অংশ দখল করতে না পারে, ইতিমধ্যে সমস্ত দৈবপ্রচেষ্টা ব্যর্থ করে বলাই রাজ মারা যান। বলাইয়ের মৃত্যুতে দৈব পুকুরের প্রচারে সামান্য হলেও অসুবিধার সৃষ্টি করে। যদিও বিশ্বাসীদের বক্তব্য ছিল—প্রণামীর পয়সা চুরি করাই বলাইয়ের মৃত্যুর কারণ। বলাই মারা যাওয়ার পর তার ভাই দিলীপ পুকুর কাণ্ডের নায়ক হন, তাঁর মদতে চলতে থাকে দৈব ব্যবসা।

এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসেন পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ ও সংগঠন। তাঁরা স্থির করেন সরেজমিন করে এর সত্যতা জানবেন ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবেন।

সেই উদ্দেশে গত ২৩শে এপ্রিল ২০১০ সনিবার কলকাতার চেতনা গণ-সাংস্কৃতিক সংস্থা, গণ বিজ্ঞান সমন্বয় কেন্দ্র এবং বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা নাকালী গ্রামে যান। সঙ্গে ছিলেন 'স্টার আনন্দ' সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা। বিজ্ঞান ও প্রগতিশীল যুক্তিবাদী সমিতির সদস্যরা প্রথম থেকেই স্থানীয়ভাবে এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়ে এসেছেন। তাঁরা আগত দর্শনার্থীদের এই ঘটনার কুফলগুলি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁরা তাঁদের প্রচারের অঙ্গ হিসাবে পুকুরের জলও পরীক্ষা করিয়েছিলেন, যাতে প্রায় ২০০ রকমের জীবাণু পাওয়া গিয়েছিল। তাই ঐ জল কখনোই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো হতে পারে না।

আমরা যখন নাকালি গ্রামে পৌঁছই, তখন মেলা প্রায় শেষের পথে। একটি মেয়ে, যার নাম সরলা সর্দার, (জীবিকা—মনসার গান গাওয়া) ঠায় ঐ রোদ্দুরের মধ্যে বসে আছে। পরনে মনসার বেশ, হাতে জ্যান্ত একটি সাপ, তার সামনে একটি পরিণামীর গামলা যাতে প্রণামীর পরিমাণ বেশ ভালোই। খবরে প্রকাশ, গত সাত মাসে তার বিপুল টাকা আয় হয়। (তথ্যসূত্র:—আজকাল পত্রিকা, ২১ এপ্রিল ২০১০)। আরেকটু এগিয়ে দেখা গেল বেশ কিছু মহিলা ঝুড়িতে করে সাপ দেখিয়ে পয়সা আদায় করছেন।

পুকুরের কাছে গিয়ে দেখা গেল একফোঁটাও জল নেই, আছে শুধু পাঁক। সেটাই মাখার জন্য মানুষের মধ্যে তীব্র উন্মাদনা। পুকুরের ধারে গাছের নিচে অসংখ্য মনসা মূর্তি, তাকে ঘিরে কাদামাখা বেশ কিছু মানুষের ভিড়। হঠাৎ একটি দৃশ্য দেখে আমরা স্তম্ভিত। একটি বছর বারো কি পনেরোর বিকলাঙ্গ ছেলে, শরীরে অসংখ্য ঘা, তাকে সর্বাঙ্গে মাটি মাখিয়ে গাছতলায় ফেলে রাখা হয়েছে। তীব্র উন্মাদনায় তাঁর কাতর চিৎকার ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। আমরা এই দৃশ্য দেখে প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। মানুষকে এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বোঝানো শুরু করতেই একদল মানুষ আমাদের ঘিরে ধরে পাল্টা প্রতিবাদ জানাতে লাগল। আমরা যথাসাধ্য তাদেরও বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ গর্জে উঠলে। স্থানীয় প্রশাসন আমাদের এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনুমতি দিলেও তাদের ভূমিকা নিতান্তই সীমিত ছিল।

দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তারা অধিকাংশই সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অভাবের শিকার। অধিকাংশই নিম্ন মধ্যবিত্ত বা তারও নিচের স্তরের। ফলে তাদের পক্ষে ব্যয়বহুল চিকিৎসার ভার বহন করার সাধ্য নেই। শেষ সম্বল হিসাবে তাঁরা এখানে এসেছেন।

এছাড়া তাঁরা এমন কিছু রোগের কথা বলছিলেন যেগুলোর প্রকোপ শীতকালে বাড়ে ও গরমকালে কমে। যেমন—হাঁপানি। অথবা যে সমস্ত রোগ সরাসরি মানসিক সম্পর্কযুক্ত, যেমন, শর্করা রোগ, বাত ইত্যাদি।

স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তাঁরা এই অযাচিত অর্থ উপার্জনে বেশ খুশি। তাই এর জন্য দৈব পুকুরের মহিমা প্রচারেও বদ্ধপরিকর।

আমাদের দাবি সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক যাতে এই সমস্ত নিরপরাধ মানুষজন দিনকে দিন প্রতারিত না হন। সরকারের উচিত অবিলম্বে এই প্রতারক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইন-মাফিক ব্যবস্থা নিয়ে এই ভণ্ড ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া।

**প্রতিবেদন:** চেতনা গণ সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষে—সৌরভ বসাক, অয়ন ঘোষ, দিলীপ পাল, সুদীপ্ত ঘোষাল, পিঙ্কি চক্রবর্তী, মলয় সিংহ, সৌভিক ও অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য।

উমা

# জ্যোতিরাও ফুলে: বিদ্রোহী ও যুক্তিবাদী

## তর্কতীর্থ লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যোশী

**ভাষান্তর: প্রতুল মুখোপাধ্যায়**

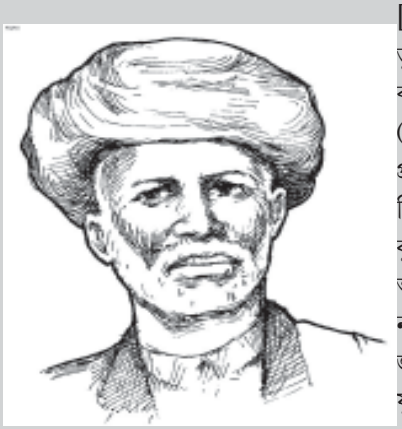

জ্যোতিরাও ফুলে
(১৮২৭-১৮৯০)

[ঊনবিংশ শতাব্দিতে আমাদের দেশে সমাজসংস্কারকেরা জনমানসে প্রবল জোয়ার তুলেছিলেন—বাঙলায় রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত আর বাঙলার বাইরে জ্যোতিরাও ফুলে, গোপাল গণেশ আগারকর (১৮৫৬-১৮৯৫), রুচিরাম সাহানি (১৮৬৩-১৯৪৮) প্রভৃতি। সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এইসব প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীরা। আমাদের যেটুকু চর্চা প্রধানত তা ওই বিদ্যাসাগর ও রামমোহনকে নিয়ে সীমাবদ্ধ, ইদানীং অবশ্য সুদীর্ঘ উপেক্ষার প্রাচীর সরিয়ে সামনে এসেছেন অক্ষয় কুমার দত্ত। জ্যোতিরাও ফুলে, আগারকর কিংবা রুচিরামরা লক্ষ্যণীয়ভাবে অনুপস্থিত। অথচ জ্যোতিরাও ফুলে শুধু যে ঔপনিবেশিক শিক্ষার সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন তা নয়—'ছোট'জাতের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারেও অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফলে জাতিভেদপ্রথা ও সমাজে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান। জ্যোতিরাও ফুলে কিন্তু সে যুগেই দলিতদের শিক্ষার সুযোগ করে দিতে পেরেছিলেন। এই অবিস্মরণীয় মনীষীর জীবন ও কর্মধারা নিয়ে এ পর্যায় শুরু।]

**সম্পাদকমণ্ডলী**

ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাত মেধায় ও বুদ্ধিতে অগ্রণী ভারতীয়দের মধ্যে এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করল। সে প্রতিক্রিয়ার ছিল দুটি অভিমুখ—একটি অনুকূল বা পক্ষে, অপরটি প্রতিকূল বা বিপক্ষে। অনুকূল প্রতিক্রিয়ার থেকে বেরিয়ে এল অন্তর্বীক্ষণ, আত্মপরীক্ষা, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানসম্মত সমালোচনার মতো বিষয়ে আগ্রহ, সংস্কারের আকাংক্ষা এবং সমাজ ও সংস্কৃতিকে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্য সামগ্রিক ব্যাকুলতা। বেশ কয়েকজন সাহসী সংস্কারক এগিয়ে এলেন সামনের সারিতে, সামাজিক বিকাশের গতিপথকে বদলে দেবার আকুল আকাংক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। সমাজের নড়নচড়ন বন্ধ রাখার জন্য দু হাজার বছরেরও বেশি পুরোনো সাংস্কৃতিক জগদ্দল পাথর তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। যুগযুগ ধরে টিকে থাকা অন্ধবিশ্বাসের পরম্পরার পরিণাম নিশ্চল সামাজিক বিধিবিধান তাঁদের পথে খাড়া করতে লাগল বাধার পর বাধা। দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকা নানা প্রতিষ্ঠান, গভীরে শিকড় নামিয়ে দেওয়া প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরের ঐতিহ্য এবং এ সব কিছুতেই দৃঢ়বিশ্বাসী এক জাতি—সব মিলিয়ে বাধা ছিল দুর্লঙ্ঘ্য। আবার অন্যদিকে পশ্চিমের নতুন নতুন ভাবনার ও কীর্তির অনুপ্রেরণায় তাঁদের মধ্যে জেগে উঠল অদম্য সাহস ও অনুপম উন্মাদনা।

প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া থেকে ফুটে উঠল পশ্চিমের কীর্তির প্রতি ঈর্ষার ভাব এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সম্মানিত ও পূজিত ধর্মীয় ও অধ্যাত্মবাদ আশ্রিত সংস্কৃতি বুঝি শেষে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়—এমন আশঙ্কা। ব্রিটিশদের দেশজয়ের পথ ধরে চলে আসা পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা আপাতত এমন ভাবনা তৈরি করেছিল যে,

(ক) পরমাদৃত সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যে জ্ঞানের পরিমাণ সামান্যই, তার সঙ্গে মিশে আছে প্রচুর পরিমাণে মায়াপ্রপঞ্চ (illusion), বিনা প্রশ্নে সত্য বলে গ্রহণীয় মতবাদ (dogma) আর অতিকথা (myth);

(খ) ভারতের প্রগতির স্বার্থে পুরোনো ভাঙাচোরা সামাজিক ব্যবস্থাকে আবার নতুন করে গড়ে তোলা দরকার; এবং

(গ) যে পদ্ধতিতে কয়েকটি বিশেষ জাত নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম রাখার চেষ্টা করেছে তা খুবই দুর্বল ও অল্পস্থায়ী এবং তাদের মহত্ত্বের প্রায় সবটাই অলীক।

মান্ধাতার আমলের ধ্যানধারণার ও ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধ সমালোচকদের ধিক্কার জানালেন সনাতনপন্থীরা। তাঁদের যুক্তি, পাশ্চাত্য সভ্যতার বাইরের চটকেই সংস্কারকদের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতা ভারতের মাটিতে শিকড় গেড়ে বসবে আর দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার হুমকি দেবে—এই আশঙ্কাতেই বিরোধী প্রতিক্রিয়া

প্রকাশিত হল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষের রূপে। এই প্রতিক্রিয়া থেকেই জন্ম নিল অতীতের আদর্শায়নের এবং ধর্ম, সামাজিক প্রথা, জাতপাতের নিয়ম আর মূর্তিপূজাকে যুক্তিসম্মত রূপে দেখাবার প্রবণতা। অনেক শতাব্দীর ঐতিহ্যের সঙ্গে এই প্রবণতা ছিল এক সুরে বাঁধা, তাই সব রকম সংস্কারের প্রয়াসের প্রতিরোধে এর ক্ষমতাও ছিল অপরিসীম।

এই দুই প্রতিক্রিয়ার লড়াইকেই বলা যেতে পারে ব্রিটিশ শাসনে ভারতের সামাজিক ইতিহাসের সারাৎসার। জীবন সম্বন্ধে দুটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি বেরিয়ে এল এর ফলে। প্রথম প্রতিক্রিয়া থেকে জন্ম নিল যুক্তিবাদ ও মানবতাবাদ আর দ্বিতীয়টি থেকে হল জাতীয়তাবাদের উত্থান। যাই হোক এই দু'রকমের প্রতিক্রিয়া বাংলা ও মহারাষ্ট্রে যেমন সুস্পষ্ট ছিল, তেমনটি সারা দেশ জুড়ে ছিল না। যাঁরা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, এমন সংস্কারকদের মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে ছিলেন ধর্মীয় সংস্কারকেরা; মহারাষ্ট্রে তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন মোদক, রানাডে, ভাণ্ডারকরের মতো মানুষেরা। দ্বিতীয় ধারায় হয়েছিল যুক্তিবাদী সংস্কারকদের সমাবেশ। এঁরা ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী (agnostic), বস্তুবাদী (materialistic), জে এস মিল ও স্পেন্সার-এর অনুগামী। এঁদের মধ্যে আগারকর ও লোকহিতবাদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তৃতীয় অভিমুখ ছিল অব্রাহ্মণ সংস্কারকদের। এটি ছিল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ সব ধারার মধ্যেই ছিল একটি সাধারণ গুণ—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ভাবনাকে গ্রহণ করার উপযুক্ত মানসিকতা। যে সব সংস্কারের সমর্থনে তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, প্রত্যেকের মূল ভিত্তিই যে আধুনিক শিক্ষা, এ বিষয়ে তাঁরা একমত ছিলেন। তাঁরা সবাই এ বিষয়েও একমত ছিলেন যে জাতপাতের প্রথার দিন আর নেই, চাই ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, এবং এ দেশে একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তন।

জ্যোতিরাও ফুলে (মারাঠিরা বলেন জ্যোতিবা --- অনুবাদক) ছিলেন তৃতীয় ধারার পথপ্রবর্তক। গোঁড়ামির আধিপত্যে যারা সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করছিল সেই অব্রাহ্মণদের মনের তিক্ততা সোচ্চারে প্রকাশ করবার সময় ফুলে হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যের মূলে আঘাত করলেন। ব্রিটিশদের ভারতশাসনভার গ্রহণের আগে ব্রাহ্মণেরাই মহারাষ্ট্র শাসন করতেন। ভ্রষ্টাচার, জাতপাত নিয়ে উগ্র অন্ধ উন্মাদনা, অব্রাহ্মণদের উপর দমনপীড়ন, সরকারি কাজকর্মে তাদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং সাধারণভাবে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থাই ছিল সেই শাসনের বৈশিষ্ট্য। এই সব অভিজ্ঞতার অতলস্পর্শী পরিণতিই ছিল অব্রাহ্মণদের বিদ্রোহের মূলে।

ব্রাহ্মণ সংস্কারকদের যুক্তিবাদী-ধর্মীয় অভিমত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চৌহদ্দির বাইরে পৌঁছতে পারেনি। সোজা কথায়, তাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন ও আচার আচরণের এমন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করতেন যাতে তা তাঁদের পেশা ও ক্রমশ বদলে যাওয়া অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। খাওয়া দাওয়া, পোশাক আশাক, ভজন পূজন, অন্ত্যেষ্টিসংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি ব্যাপারে নানারকম বিধিনিষেধের এমনভাবে সংস্কার দরকার যাতে সংস্কার-উত্তর আচরণবিধি মুখ্যত সরকারের সেবায় নিয়োজিত এক নাগরিকায়িত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিভিন্ন প্রয়োজনের সঙ্গে সহজে খাপ খায়। এভাবেই যৌথ পরিবার ব্যবস্থাই হয়ে উঠল তাঁদের সমালোচনাত্মক চিন্তনের প্রধান বিষয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিবারের সদস্যেরা কাজের জন্য পরিবার ছেড়ে দূরের শহরে, জেলায় বা প্রদেশে চলে যাচ্ছিলেন। এই স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন হল কেন? কারণ এতদিন ধরে চলে আসা গ্রাম্য পেশা তাঁদের জীবিকানির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। এইভাবেই যৌথ পরিবার ভেঙে গেল। সদস্যেরা একে অন্যের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন উকিলের, ডাক্তারের, শিক্ষকের, আধিকারিকের পেশার সন্ধানে। দীর্ঘদিন ধরে পরিচলিত শিশুবিবাহ প্রথা নতুন পরিস্থিতিতে সমস্যার সৃষ্টি করল। যৌথ পরিবারের আশ্রয় ছেড়ে আসা শিক্ষিত যুবকের কাছে সাধারণ নিরক্ষর মেয়ের আকর্ষণ আর রইল না। এভাবেই নারীশিক্ষা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়াল। একরকমভাবেই বৈধব্যের সমস্যাও প্রকট হয়ে উঠল। যে সমস্ত প্রথা নারীর পরনির্ভরতা ও দাসত্ব সূচিত করত সেগুলির সংস্কারের নৈতিক অনুপ্রেরণা এল পশ্চিম থেকে শেখা মানুষের ব্যক্তিত্বের সম্মানের ধারণা থেকে। সতী (সতীদাহ প্রথা-অনুবাদক), যাবজ্জীবন বৈধব্য, শিশুবিবাহ, পর্দাপ্রথা, সম্পত্তির উত্তরাধিকারহীনতা, বিবাহবিচ্ছেদের অধিকারহীনতা—এইসব এবং আরও অনেক প্রথা কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হল।

হিন্দু ঐতিহ্য, আচার অনুষ্ঠান বিধিবিধান, জাতপাতের প্রথা, অস্পৃশ্যতা ইত্যাদির ভিত্তি হল ব্রাহ্মণ্যধর্ম। এই ধর্ম এক অপার্থিব (transcendental) মূল্যের (value) উপর ভিত্তি করে হিন্দু জীবনের সমস্ত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণকে একটা নৈতিক অনুমোদন (sanction) দিয়ে আসছিল। তাই আকাংক্ষিত সংস্কারের জন্য প্রয়োজন হল হিন্দু ধর্মেরই কঠোর সমালোচনা। সংস্কারকেরা তাঁদের অভিমত অনুযায়ী সংস্কারের ধর্মীয় অনুমোদনের প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হলেন। এই প্রচেষ্টার পথেই বাংলায় ব্রাহ্ম সমাজ এবং মহারাষ্ট্রে তার প্রশাখা প্রার্থনা সমাজ-এর আবির্ভাব। উনিশ শতকে সাংস্কৃতিক বিকাশ, মিশ্রণ ও একীভবন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেল, যখন এমন মত পোষণ করা গেল যে অস্তিত্বের বিভিন্ন রূপকে ধর্মীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক

পৃথকীকরণ থেকে তৈরি সীমানায় আর আটকে রাখা সম্ভব নয়। সেই মতেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল এই সংস্কারকদের কর্মকাণ্ডে। তাঁরা এই মতকেই স্বতঃসিদ্ধ বলে গণ্য করলেন যে সব ধর্মের অন্তর্নিহিত মূলনীতিগুলি আসলে একই। তাই তাঁরা আপ্তবাক্য বা কোন ধর্মের প্রবক্তা বা প্রতিষ্ঠাতাদের সন্দেহাতীত কর্তৃত্বকে স্বীকার করলেন না। অন্যদিকে বিচারবুদ্ধি বা যুক্তিকেই গ্রহণ করা হল দিকপ্রদর্শকের ভূমিকায়। এর ফলে পশ্চিমের ধ্যানধারণাকে আত্মস্থ করার পক্ষে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হল।

সেই সাংস্কৃতিক খণ্ডীভবন (disintegration) ও ধর্মীয় সমালোচনার আবহের মধ্যেই অব্রাহ্মণ সংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূত জ্যোতিরাও ফুলের জন্ম। অব্রাহ্মণ সমাজের একজন হওয়ার ফলে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে বিশাল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। তবুও তাঁর গভীর ও অন্তর্ভেদী বুদ্ধি এবং অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ ও পরিণত মন সেই সময়ের বদলাতে থাকা পরিস্থিতির অর্থটি পুরোপুরি বুঝে নিতে ভুল করে নি। ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠার পথ ধরে সুদূরপ্রসারী ও সর্বব্যাপী পরিবর্তনের তাৎপর্য তাঁর মতো করে লক্ষ করেছিলেন খুব কম মানুষই। যাঁরা সবচেয়ে আগে হিন্দুধর্মের মধ্যেই বাসা বাঁধা সামাজিক দাসপ্রথা সম্বন্ধে সজাগ হয়েছিলেন, সেই দাসপ্রথাকে আগাগোড়া বুঝতে পেরেছিলেন, ফুলে ছিলেন তাঁদেরই একজন। যারা নিজেদের দাসত্বকে বুঝতেই পারে না, তারা সেই দাসত্ব থেকে মুক্ত হতেও পারে না। জ্যোতিবা-ই অনেক শতাব্দী ধরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অধঃপতিত অবস্থায় বেঁচে থাকা মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তাদের অস্তিত্বের স্বরূপ। তিনি ছিলেন এক বিদ্রোহী—ঈশ্বরের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে এবং অতীতের তথাকথিত পবিত্র ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে।

জাতপাতের নিরিখে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য, জাত অনুযায়ী সমাজের নিচতলা থেকে ওপরতলার ভেদাভেদের নিয়মের কঠোরভাবে অনুসরণ, ধর্মের নামে অন্ধ বিশ্বাস ও অজ্ঞানতার সযত্ন প্রতিপালন, বিশ্বাসের নামে শুদ্ধ বা পবিত্র করে নেওয়া নির্বোধ আচার অনুষ্ঠানের প্রাধান্য—এইরকম যত সামাজিক কুকর্মের প্রকোপ খুবই বেড়ে গিয়েছিল মাহ্‌রাট্টা রাজত্বের শেষদিকে একেবারে উচ্ছন্নে যাওয়া ব্রাহ্মণ শাসনে। আইনকে কখনো ঠিকমতো গ্রন্থিত করা হয়নি। তাই আইনমাফিক কাজকর্মও ছিল আরও উদ্ভট আর খামখেয়ালি। ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ, অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি এবং চাকরির শর্ত—সব কিছুর মধ্যেই ছিল চূড়ান্ত বিভ্রান্তি, যার ফলে অশেষ দুর্ভোগ আর ঝামেলা পোয়াতে হত চাষীদের আর চাকুরেদের। ফুলে এ সব দুরবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন ইশারা (সাবধানবাণী) নামে তাঁর এক প্রবন্ধে:

'অনেকদিন আগের কথা নয়, আর্য পেশোয়াদের শেষ প্রতিনিধি রাও বাজীর শাসন শেষ হবার আগে পর্যন্ত, যদি কোন চাষীর ভূমিরাজস্বের সামান্য কিছু পাওনা বাকি থাকত, তাকে অর্ধেক নুয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত গনগনে রোদে; তার পিঠে চাপানো হত ভারী পাথর, কখনও বা তার স্ত্রীকে বলা হত সেই নোয়ানো পিঠের উপর চেপে বসতে। নীচে তার সামনে আগুন জ্বালানো হত আর তাতে শুকনো লঙ্কা ছুঁড়ে দেওয়া হত। প্রজাদের সঙ্গে শাসক জানোয়ারের মতো ব্যবহার করতেন। রোদবৃষ্টিতে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে শাসকদের আর তাদের জাতের নরনারীদের খাদ্যবস্ত্র উৎপাদন করা, তাঁদের নানা বিলাসব্যসনের জোগান দেওয়া—এ কাজেই লাগানো হত ওদের। এবার যখন এই (ব্রিটিশ) রাজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, জাত-ঘৃণার সৃষ্ট নৈতিক রাজনৈতিক আর অন্য উৎপীড়ন থেকে মুক্ত হবে সাধারণ মানুষ।'

সরকার সবসময়ই সাউকার (সুদখোর মহাজন)-এর সহায়, খাতককে সারাক্ষণ হয়রান করা হত এবং সর্বস্ব খোয়াবার সম্ভাবনার সামনে দাঁড়াতে হত তাকে। এমন অবস্থার বর্ণনা করেছেন জ্যোতিবা। তাঁর ভাষায়, 'সে সব দিনে, পাওনাদারকে দেওয়ানি মামলা দায়ের করতে হত না। কারণ সাউকারের নিজের বাড়িতেই তো সরকার। তিনি তাই যখন তখন খাতককে মারধোর করতে পারেন, তার সর্বস্ব কেড়ে নিতে পারেন, তার গোরুবলদ বিক্রি করে দিতে পারেন, তার ওপর, তার পরিবারের লোকের উপর নানারকম অত্যাচার চালাতে পারেন, মাথার ওপর ভারী পাথর চাপিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া রোদের তাপে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন। ... সাত আট টাকার জন্য গরীব চাষীটিকে তার জমি, গোরুবলদ, কুয়ো, সব কিছু হারাতে হতে পারে আর তার নিজের পরিণতি হতে পারে ভবঘুরের অস্তিত্ব নয় আত্মহত্যায় মৃত্যু।'

জাতের বৈষম্য খুব বেশি তীব্র হয়ে উঠেছিল পেশোয়াদের আমলে। ব্রাহ্মণদের অপরিসীম ঔদ্ধত্য ও ভণ্ডামির বেশ কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন জ্যোতিবা। তিনি লিখছেন, 'যদি কোন ব্রাহ্মণের কোন নদীর তীরে আসার কথা হয় আর যদি এমন হয় যে সেখানে এক শূদ্র (অব্রাহ্মণ) কাপড় কাচছে তবে সেই শূদ্রকে সব কাপড় তুলে নিয়ে এমন দূরে চলে যেতে হবে যাতে সেই ব্রাহ্মণের কলুষিত হবার সমস্ত সম্ভাবনা এড়ান যায়। যদি শূদ্রের কাচা কাপড় থেকে এক ফোঁটা জলও ব্রাহ্মণকে দূষিত করত, তাহলে ব্রাহ্মণ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করে হাতের পিতলের জলপাত্র দিয়েই লোকটিকে আঘাত করতেন। সে ক্ষেত্রে অভিযোগ করার কোন অর্থই হয় না, কারণ তখন তো ব্রাহ্মণেরই শাসন। বরং অভিযোগকারীর নিজেরই শাস্তি হতে পারত।'

অস্পৃশ্যদের ওপর যে নির্যাতন চলত তা ছিল আরও ভয়ানক, প্রায় কল্পনাতীত। তাকে সবসময় সতর্ক থাকতে হত

যাতে তার ছায়া কোন ব্রাহ্মণকে কলুষিত করতে না পারে। সকালে আর সন্ধ্যায় ছায়া সবচেয়ে বেশি লম্বা হয়। তাই সে সময় তার পক্ষে বর্ণ হিন্দুদের পাড়ায় চলাফেরা করা ছিল খুব বিপজ্জনক। তাকে গলায় ঝোলাতে হত একটি মাটির পাত্র (যা পিকদানি হিসেবে ব্যবহার করা হত)। সেখানে তাকে যেতে দেওয়া হত যদি সে কোমরে বাঁধতো পাতাশুদ্ধ ডালপালা যা তার পেছন পেছন তার অপবিত্রকারী পায়ের ছাপগুলো ঝাঁট দিতে দিতে চলত। সংক্ষেপে বলা যায়, পেশোয়াদের আমলে অস্পৃশ্যদের জীবন ছিল পশুদের চেয়েও খারাপ। আর ব্রাহ্মণদের জীবন ছিল দেবতাদের চেয়ে ভাল। জ্যোতিবার অভিযোগ---সরকারি তহবিলের একটি বড় অংশ খরচ হত ব্রাহ্মণদের ভূরিভোজে আর ব্রাহ্মণদের জন্য দক্ষিণায় (পুরোহিত শ্রেণীর জন্য আর্থিক উপঢৌকনে)। পরজীবী, ভ্রষ্টাচারী আর অনন্তলোভ ব্রাহ্মণ আর দুর্দশাগ্রস্ত, অধঃপতিত দরিদ্র শ্রমজীবীদের মধ্যে হৃদয়বিদারী বৈসাদৃশ্য সঠিকভাবেই ফুটে উঠেছে তাঁর দক্ষ কলমে। সেই সময়ের আইন অনুযায়ী নানারকম শাস্তির কথাও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করেছেন তিনি। বেশির ভাগ সময়ই সাধারণ অপরাধের শাস্তি ছিল অঙ্গহানি—হাত বা পা কেটে ফেলা। এ ধরনের শাস্তি অবশ্য পেশোয়াদের শাসনকালের কোন বিশেষ ব্যাপার নয়---সাধারণভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে সমস্ত শাসনকালেরই সাধারণ লক্ষণ বলা যায়। এ পেশোয়াদের পাপ নয়, শতাব্দীব্যাপী প্রাচীন ঐতিহ্যের পাপ।

ব্রাহ্মণদের রাজত্বকালে বিরাজ করত চরম বিশৃঙ্খলা। জনসাধারণ ছিল ডাকাত (পেন্ধারী), ভ্রাম্যমাণ দুর্বৃত্ত ও গুণ্ডাদের হাতের মুঠোয়; তাঁরা ছিল নিতান্তই অসহায়, সম্পত্তির সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কিছু উৎপাদন করে তা ভোগ করবার বা তা নিয়ে আনন্দ করার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। উৎপাদনের সমস্ত প্রয়াসই পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। এই কারণেই সাধারণ মানুষ ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটেই জ্যোতিরাওয়ের মত সংস্কারকেরা অতীতকে ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রিটিশ শাসনের মধ্যেও পুরোনো রীতিনীতির অটল অবস্থান তাঁদের প্রণোদিত করল এর বনিয়াদটিকেই ভালভাবে পরীক্ষা করতে। ভারতের ইতিহাসের অর্থ, ভারতের জীবনের অর্থ—জীবন বলতে মানুষ সত্যি যে ভাবে বেঁচে থাকে সেই জীবনের অর্থ তাঁদের চোখে ফুটে উঠল এর ফলে। তাঁরা যে ব্রিটিশ শাসনকে নিন্দা করবার বদলে স্বাগত জানিয়েছিলেন এর পথ ধরে ধারণার বন্ধনমুক্তির জন্য, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পশ্চিম নিয়ে এসেছিল মানুষের স্বাধীনতার বার্তা। এই বার্তাই জ্যোতিবার মতো মানুষদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিল অনেক শতাব্দী জুড়ে বাস্তবিক ও আত্মিক দাসত্বে বন্দী ভারতীয় মানবতাকে সেই দাসত্ব থেকে মুক্ত দেখবার এক তীব্র ও আবেগমথিত আকাংক্ষা।

সমাজসংস্কারের আন্দোলন কিন্তু না পেরেছে ভারতের মাটিতে দৃঢ়মূল হয়ে দাঁড়াতে, না তাতে সঞ্চারিত হয়েছে প্রয়োজনীয় শক্তি বা গতিবেগ। জ্যোতিবা তাঁর মনকে নিবিষ্ট করলেন সামাজিক অধঃপতনের কারণগুলি খুঁজে বার করবার কাজে। দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিষয়ে তাঁর সমীক্ষায় প্রকাশিত হল যে অধঃপতনের মূল কারণটি নিহিত আছে হিন্দু সমাজের মধ্যেই। আরও বিশদ বিশ্লেষণের পর তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে হিন্দু ধর্মের ও ব্রাহ্মণদের গোঁড়ামিই এই অবনতির জন্য দায়ী। তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছিল *সভ্য ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ছদ্মবেশে সামাজিক দাসপ্রথা* (*Social Slavery in the Guise of Brahmanical Religion under the Civilised British Rule*)। এই বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল 'সেই সব আমেরিকান নাগরিকদের যাঁরা নিগ্রোদের মুক্তির জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।'

এই বইয়ে তিনি লিখছেন, ' এমন কি ব্রিটিশ শাসনেও অব্রাহ্মণ জনগণকে নানা দুঃখকষ্ট ভোগ করতে বাধ্য করা হয়, তার কারণ আইনকে কাজে পরিণত করার ভার যে আমলাদের উপর তাঁরা প্রায় সবাই ব্রাহ্মণ। জাতের মর্যাদা অনুযায়ী নিচ থেকে উপর পর্যন্ত কাঠামোর নিয়মকানুন একই রকম কঠোরভাবে মানা হয়। পুনার মতো শহরেও ব্রাহ্মণদের জল নেবার জায়গায় অব্রাহ্মণরা জল নিতে পারেন না। সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও ব্রাহ্মণদেরই প্রাধান্য। পাঠ্যবইগুলি এমনভাবে লেখা হয় যাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ও শাস্ত্রের দুর্বলতাগুলি গোপন থাকে। গ্রামের বিপুল জনসাধারণের বিশেষ করে কৃষকদের শিক্ষার বিলাসিতার সংগতি নেই। তাঁরা নিরক্ষর এবং সেজন্যই তথাকথিত শিক্ষিতদের হাতে তারা কষ্ট পেতেন ও ঠকতেন। ধর্মবিশ্বাস আর নানা কুসংস্কারের জন্যই তাদের হাড়ভাঙা খাটুনির টাকা ফালতু কাজে খরচ হয়ে যায়। হতে পারে তাদের উপর অবিচারের বিষয়ে তাঁরা অজ্ঞ, কিংবা এমনও হতে পারে তারা সচেতন, কিন্তু অজ্ঞানতা ও দারিদ্র্যের দরুন এই অবিচারের প্রতিকার করতে পারে না। তাদের ক্ষোভের কারণের দিকেই কারও নজর নেই, প্রতিকারের চেষ্টাও নেই কারও। আত্মিক দাসত্ব সম্বন্ধে তাঁর অভিমত, দাস হলেই যে তাদের মধ্যে দাসত্ব মোচনের প্রচণ্ড তাগিদ দেখা যাবে, এমন কোন কথা নেই। অনেক দাস তো প্রভুদের পক্ষের লোক হিসেবেই পরিচিত। মার্কিন নিগ্রো ক্রীতদাসেরা তাদের নিজেদের দাসত্ব দূর করার বিষয়টিকে ততটা গুরুত্ব দেননি, যতটা দিয়েছিলেন কয়েকজন স্বাধীন শ্বেতাঙ্গ ও মার্কিন নাগরিক। ব্রিটিশ আমলারা কোঙ্কনের বিভিন্ন জেলায় খোত জমিনদারদের প্রজাদের দুর্দশার প্রতিকারের জন্য একটি কাজের ছক (Scheme বা পরিকল্প) তৈরি করেছিলেন। জমিনদাররা যে প্রজাদের উপর প্রচণ্ড মারধর আর

নির্যাতন চালাতেন, তা জানাই ছিল। তা সত্ত্বেও সাক্ষী হিসেবে প্রজাদের ডাকা হলে তারা সবাই প্রভুদের পক্ষেই সাক্ষ্য দিল। এজন্যই আসছে জনগণকে শিক্ষিত করার প্রয়োজনীয়তার কথা এবং এ শিক্ষা হওয়া চাই আধুনিক শিক্ষা যা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আপাতনির্দোষ কুসংস্কারগুলির প্রতিষেধকের কাজ করবে।

জ্যোতিবা কৃষির আধুনিকীকরণের পক্ষেও তাঁর অভিমত জানিয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন চড়া সুদে তেজারতি কারবারের বিরুদ্ধে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন দিয়ে প্রজন্ম প্রজন্মান্তর ধরে দাঁড়িয়ে থাকা সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব নয়, এ ব্যাপারটা মনে হয় তাঁর ঠিক খেয়াল হয়নি। উদারনীতির ধারক ও বাহক পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর তাঁর আশা ছিল আকাশছোঁয়া আর তাই ব্রিটিশ রাজত্বের অন্ধকার দিকটা তাঁর নজর এড়িয়ে গিয়েছিল। তিনি তাঁর সত্যশোধক (সত্যসন্ধানী) আন্দোলন শুরু করেন ১৮৫৭ র মহাবিদ্রোহের পর। সে সময় শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের একটি অংশের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের ব্যাপকতা লক্ষণীয় ছিল। তাঁরা বিদ্রোহের ব্যর্থতায় দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন এবং কখনও নিজেদের উদ্যোগে, কখনও সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রসারের চেষ্টা করেছিলেন।

মহাবিদ্রোহ সম্বন্ধে জ্যোতিবা-র অভিমত অদ্ভুত লাগতেই পারে। বিদ্রোহের ব্যর্থতায় তিনি দুঃখপ্রকাশ তো করেনই নি, বরং আনন্দিত হয়েছিলেন। মোটেই জনপ্রিয় ছিল না এই অভিমত। কিন্তু একজন বিজ্ঞানমনস্ক ইতিহাসবিদের কাছে তা উপেক্ষণীয় ছিল না। তাঁর যুক্তি, ব্রিটিশ শাসন ভেঙে পড়লে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হত। আবার ফিরে আসত ব্রাহ্মণ পেশোয়াদের শাসন; ঐতিহ্যবাহী হিন্দুধর্ম তার কর্তৃত্ব ফিরে পেত আর লক্ষ লক্ষ অবদমিত মানুষের মুক্তির অতিসামান্য আশাটুকুও পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যেত। তিনি আরও বলছেন, এ দেশে সামাজিক অন্যায় অবিচার হাজার হাজার বছরের পুরোনো, এর শিকড় চলে গেছে গভীরে। ব্রিটিশ রাজ আজ আছে, কাল নাও থাকতে পারে; সে যাই হোক, মুখ্য বিচার্য বিষয় কিন্তু সামাজিক দাসপ্রথার অবসান, যে দাসপ্রথার অনুমোদন এসেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে।

*দাসত্ব* নামের এক লেখায় ফুলে ব্রাহ্মণদের মানসম্ভ্রম, তাঁদের চিন্তাধারা, তাঁদের নানা প্রতিষ্ঠান কীভাবে গড়ে উঠল—এ সবই খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, হিন্দুদের সামাজিক দাসপ্রথার জন্য দায়ী অজ্ঞানতা আর অন্ধবিশ্বাস কিন্তু ব্রাহ্মণদেরই সৃষ্টি। ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব কখন এবং কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল তার সাক্ষ্য বহন করবার মতো কোন প্রত্যক্ষ প্রামাণ্য ঐতিহাসিক উপকরণ নেই। ফুলে তাই শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণের মতো ধর্মশাস্ত্রীয় সাহিত্যের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলছেন, আর্যেরা পারস্য থেকে সমুদ্রপথে দুবার ভারতে এসেছে এবং দেশটিকে জয় করবার চেষ্টা করেছে। সে সময়টা হল 'মৎস্য' এবং 'কৎস্য' [সম্ভবত কচ্ছপ বা কূর্ম - অনুবাদক] অবতারের, দুটিই জলচর জীব। হানাদারেরা অবশ্য ভারত জয় করতে ব্যর্থ হল। তারপর তারা এল ডাঙায়। এর পরের তিন অবতার, বরাহ, নরসিংহ ও বামন অবতারের কাহিনী হচ্ছে আর্য আগ্রাসনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ইতিহাস। বামন অবতারের সময় তাদের বিজয় প্রায় সম্পূর্ণ; তারপর পরশুরাম অবতারের সময় তারা গণহত্যা চালিয়ে যোদ্ধা ক্ষত্রিয় জাতিকে নির্মূল করে তাদের শাসনকে সুদৃঢ় করল। তাদের শাসন কায়েম হবার পর, একে চিরস্থায়ী করবার লক্ষ্যে ব্রাহ্মণেরা দেব আর দানবের উদ্ভট কাল্পনিক কাহিনী দিয়ে সাধারণ মানুষকে হতবুদ্ধি করবার ব্যবস্থা করল আর চালু করল এমন সব সামাজিক প্রথা যা সাধারণ মানুষকে পরিণত করল গোলামে। পুরাণ কাহিনীগুলির মূল উপজীব্য হল চাতুরি, জোচ্চুরি আর ধাপ্পা। ব্রাহ্মণেরা জাতের গরিমা আর অস্পৃশ্যতার ধারণাও সৃষ্টি করল। এই উঁচু-নিচুর ধারণার লক্ষ্য ছিল ব্যাপক জনসাধারণকে চিরদিনের মতো ভাগ করে রাখা; কারণ বিজিতেরা সংখ্যায় বিজয়ীদের থেকে অনেক অনেক বেশি। সুতরাং তাদের শাসন করার একমাত্র উপায় হল তাদের বিভাজন। ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যাদের ছিল অগ্রণী ভূমিকা, তাদের নামিয়ে আনা হল অস্পৃশ্যদের স্তরে।

ফুলে-র মতে ব্রাহ্মণরাই এ দেশে বহিরাগত, যদিও সাধারণভাবে প্রচলিত মত অনুসারে আর্যেরা সবাই বিদেশি আর তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণই আছে। মনে হয় ফুলের ধারণার সৃষ্টি হয়েছে মহারাষ্ট্রে ও দক্ষিণ ভারতে এখনকার সামাজিক কাঠামো থেকে। এ সব অঞ্চলে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের মতে বর্ণ দুটিই—ব্রাহ্মণ আর শূদ্র। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণদের মধ্যে এই বিশ্বাসই চলে আসছে—যারা ব্রাহ্মণ নয় তারা সবাই শূদ্র।

ফুলে মনে করেন, ভারতের পুরাকালীন ইতিহাস হল ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস। তাঁর মতে আজকের শূদ্রেরা, অস্পৃশ্যেরাই প্রাচীনকালের ক্ষত্রিয়। বিদেশ থেকে আসা আর্যরা ছিল ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রে দেশজ বীর ক্ষত্রিয়দের ব্রাহ্মণদের শাস্ত্রে নাম দেওয়া হয়েছিল অসুর। প্রহ্লাদ, হিরণ্যকাশ্যপ [আমাদের পরিচিত নাম হিরণ্যকশিপু - অনুবাদক] এবং বামন-এর গল্পে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের প্রাচীন সংগ্রামের কথাই ধরা আছে। ফুলে অব্রাহ্মণদের পূজিত দেবতা ও তাদের ঘিরে উৎসব, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির নাম দিয়েছেন মূলবাসীদের ধর্ম। অব্রাহ্মণদের পূজিত অ-বৈদিক দেবতাদের সম্বন্ধে ফুলের ব্যাখ্যার সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব যথেষ্ট। মনে করা হয়, এদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ দেবতাদের ব্রাহ্মণেরা মেনে নিয়েছিল। মূলবাসী অব্রাহ্মণদের ধর্মের সঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণদের ধর্ম অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলেমিশে গেছে। ফলে দেবতাদের মধ্যে কারা কারা আদি তা বলা হয়ে গেল শুধু খুবই

শক্ত তা নয়, রীতিমত সতর্কতা সাপেক্ষ।

কেউ কেউ এমন মত পোষণ করেন যে ভাগবত ধর্মই হচ্ছে যথার্থ জনসাধারণের ধর্ম। ফুলে এই মতে আপত্তি জানিয়ে বলেন যে কবি-সন্তেরা ভক্তি-ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে সোজাসুজি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বন্ধনকেই দৃঢ় করেছেন। ফলে সাধারণ মানুষের মনে 'কর্মের' (কর্মফলের - অনুবাদক) তত্ত্বও বেশ পাকাপোক্তভাবে বসে গেছে। ভগবদ্‌গীতা ও ভাগবত ধর্ম দুটিতেই বর্ণাশ্রম, পুনর্জন্মবাদ আর কর্মবাদের প্রচার করা হয়েছে। তার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসহায়তা, নিষ্ক্রিয়তা আর দাসত্বকেই পরমপ্রাপ্তি হিসেবে মেনে নেওয়ার মনোভাব বেড়ে গিয়েছে। ভাগবত ধর্মের শিক্ষার সারবস্তু হল, 'ভগবানের যেমন ইচ্ছা তেমন অবস্থাতেই শান্তিতে বেঁচে থাকো।' তার মানে জনসাধারণের মুখ বুজে সামাজিক দাসপ্রথা মেনে নেওয়া উচিত। এ হল ধর্মের আদেশ। ফুলের এই মন্তব্য অপ্রিয় হলেও সত্যি। পুতুল পূজো, তীর্থ করা, মঠমন্দির, আচার-অনুষ্ঠান, ভজন, গুরু সেবা এ সবই হল ভাগবত ধর্মের অঙ্গ। এ সবের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে সময়, শক্তি আর সম্পদের অপচয়। প্রতিদানে ভাগবত ধর্ম সামনে মেলে ধরে স্বর্গ-নরক-পুনর্জন্মের বিভ্রান্তিকর ধ্যানধারণা।

ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ফুলে প্রতিষ্ঠা করলেন সত্যশোধক সমাজ (সত্যসন্ধানী সমাজ) ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সংগ্রাম থেকে সুফল পেতে হলে মূলনীতিগুলি শুধু হিন্দুধর্মের নয়, আসলে যে কোন ধর্মের নীতির চেয়ে আরও উন্নত, আরও মহান হওয়া চাই, এ বিষয়ে ফুলে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। তিনি দেখান—প্রতিটি প্রতিষ্ঠিত ধর্ম কোন না কোন অন্যায় বা অবিচার গোপন করে রাখে এবং সেজন্যই সব ধর্মকেই সত্যকে কমবেশি চেপে রাখতে হয়। ধর্মীয় বিভেদ মানুষের মধ্যে সৌভ্রাত্র ও অবাধ সহযোগিতার পথে বাধার সৃষ্টি করে । ধর্ম মানবতাকে ভাগ করেছে, মানুষে মানুষে চিরস্থায়ী সঙ্ঘর্ষের বীজ বপন করেছে। ধর্মীয় উন্মত্ততা প্রায়ই মানুষের রক্ত ঝরিয়েছে। মানুষের একতা এক মহান সত্য আর ধর্মীয় গোঁড়ামি সেই একতাকেই ধ্বংস করতে চায়। মানুষকে নির্মল করে তুলে, তাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বদলে ধর্ম প্রায়ই তার অধঃপতনের কারণ হয়ে ওঠে।

ধর্মের ক্ষেত্রে যা সত্যি তা জাতীয়তাবাদ এবং দেশাত্মবোধের ক্ষেত্রেও সত্যি। এই দুটি ধারণা একদল মানুষকে আর একদল মানুষের বিরোধিতায় প্ররোচিত করেছে। তারই পরিণাম হল যুদ্ধ এবং মানুষের সৃজনশীলতার বিপুল অপচয়। বিভিন্ন জাতিকে সব সময়ই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়; সেনাবাহিনীর জন্য খরচ করতে হয় বিপুল পরিমাণ অর্থ, সাধারণ মানুষদের বিশেষত কৃষকদের করের বিশাল বোঝা বইবার কষ্ট স্বীকার করতে হয়। এই যুদ্ধ আর আগ্রাসন পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে এবং সেজন্যই ধর্মীয় গোঁড়ামির বিকৃত মানসিকতাকে দূর করতে হবে।

*সার্বজনিক সত্য ধর্ম* নামে এক রচনায় ফুলে তাঁর গঠনমূলক ধারণার বিকাশ ঘটিয়েছেন এবং এর মাধ্যমেই সত্যশোধক সমাজকে দিয়েছেন এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন। সমস্ত ধর্মীয় ও জাতীয় বিভেদের বিরুদ্ধে এক মহান সত্যকে ফুলে দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেছেন। সেই সত্য হল মানুষের একতা; সমস্ত মানবিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হতেই হবে 'স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী'র উপর ভিত্তি করে এক অখণ্ড মানব পরিবার গঠন করা। অধিকারের ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য থাকবে না। কোন মানুষ বা মানুষের সমষ্টির অন্য কোন মানুষ বা মানুষের সমষ্টির উপর আধিপত্যের অধিকার থাকবে না। ঈশ্বর সমস্ত মানুষকে জন্মগত অধিকার হিসেবেই অর্পণ করেছেন ধর্মের ও রাজনীতির স্বাধীনতা; যে কেউ এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে তাকে সত্যের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করতেই হবে। ধর্ম ও রাজনৈতিক মতের জন্য কেউ যদি কোন ব্যক্তির উপর অত্যাচার চালায়, তাহলে তাকে সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হবে। প্রত্যেক মানুষের তার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ধ্যানধারণার প্রচার ও প্রসারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অবশ্যই থাকতে হবে। শুধু তাই নয় প্রত্যেকেরই আছে পৃথিবীর সব কিছু পূর্ণভাবে উপভোগ করার অধিকার। জমি চাষ করা, হস্তশিল্প বা অন্য কোনও পরিশ্রমের কাজ করলেই মানুষ নিচুশ্রেণীর হয়ে যায় না; বরং এতে তার মহত্ত্বই প্রমাণিত হয়। মানুষের মৌলিক অধিকার ও কর্তব্য হল প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির নিয়মগুলিকে বুঝে নিয়ে সেই জ্ঞানের ভিত্তিতে সেই শক্তিগুলিকে নিজের প্রয়োজন মেটানোর কাজে লাগানো। চেষ্টা করলে মানুষ এই পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করতে পারে। পৃথিবীতে মানুষের প্রথম কর্তব্য হল মানুষের অস্তিত্বের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির উৎপাদন ও সংগ্রহ। এই কাজে একের অন্যকে সহায়তা হল সেই কর্তব্যেরই উচ্চতর রূপ। এই হল ঈশ্বরের সত্যিকারের পূজা। ভজন, জপ, ইত্যাদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। কারণ তিনি তো এই বিশ্বসংসারের প্রভু। মানুষের প্রশংসা, পূজা বা ভক্তিতে তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। মথি লিখিত সুসমাচারে বর্ণিত যিশুখ্রিস্টের ধর্মোপদেশ (Sermon on the Mount) অনুযায়ী চললেই মানবজীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

ফুলে বর্ণিত 'সত্য'কে বলা যেতে পারে সভ্যতার ঊষাকাল থেকে মানুষের অর্জিত ও নির্মিত জ্ঞান ও সংস্কৃতির সারাৎসার। সত্যকে ও সত্যের নির্ণায়ক মাপকাঠিকে জেনে নেওয়ার উপায় সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। সত্যকে যদি শাস্ত্রে, মহাগুরুর বার্তাবহের, সাধুসন্তের, বিভিন্ন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার প্রচারে উপদেশে বা বাণীর মধ্যে দেখতে না পাওয়া যায়, তবে সত্যকে কোথায়

খুঁজতে হবে? ফুলে বলেন, মানুষের যুক্তির, বিচারবুদ্ধির মধ্যেই সত্যকে খুঁজতে হবে। সেই বিচারবুদ্ধি, যা বিশ্বজ্ঞান ও নৈতিক সত্যের কাছে মানুষকে নিয়ে যায়, তা কিন্তু সব মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত আছে। এই বোধ-ই মানুষকে ঈশ্বরের দান। তিনি দেননি কোন বিনা প্রশ্নে শিরোধার্য ধারণা, শাস্ত্রের পুঁথিপত্র, তিনি ঋষি বা সন্তদের 'দর্শন' দেন না, উপদেশও দেন না, ঈশ্বরের কোন শরীরধারী অবতারও নেই, তিনি কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করেন নি। সমস্ত নরনারীকে তিনি দিয়েছেন এক ও একমাত্র উপহার—যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি।

দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণাটি বাদ দিলে ফুলে এমন একজন যুক্তিবাদী যার যুক্তি স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। তিনি কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে স্বীকৃতি দেন না। অন্যদিকে তিনি বিবেক ও বিচারবুদ্ধির মধ্যে কোন পার্থক্যের রেখা টানেননি। পূজা, প্রার্থনা, ভজনের প্রত্যাশা করেন না ঈশ্বর। মানুষের এ সব করবার কোন প্রয়োজন নেই—শুধু তাই নয়, এ সব করা হল সময়ের অপচয়—এই হল তাঁর মত। 'অন্য কোথাও আর এক বিশ্ব', পুনর্জন্ম, স্বর্গ, মুক্তি বা পরিত্রাণ, কর্মফল—এ সবের কিছুই মানেন না তিনি। ঈশ্বরকে জানা বা দেখা সম্ভব নয়। তিনি কাউকে ভালবাসেন না, ঘৃণাও করেন না। তিনি এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, কিছু নিয়মনীতি বেঁধে দিয়েছেন এবং যার এই নিয়মনীতি বুঝে নেবার মতো ক্ষমতা আছে, এমন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে যুক্তি বা বিচারবুদ্ধি দিয়েছেন এবং তা ব্যবহার করবার ক্ষমতা দিয়েছেন। স্বর্গে যাবার বৃথা চেষ্টা, পরিত্রাণ বা মুক্তির চেষ্টা ঈশ্বরকে দেখার চেষ্টা—এমন কোন চেষ্টাই মানুষের করা উচিত নয়। কারণ এ সব করা সম্ভব নয়। মানুষের বরং এই চেষ্টাই করা উচিত, যাতে সে পার্থিব জীবনে যতটা সম্ভব ভাল উপায়ে বাঁচতে পারে। এ থেকে মনে হতে পারে ফুলে-র ঈশ্বরের ধারণার উৎস নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত দার্শনিক তৃপ্তিবোধ। তিনি নিজে ছিলেন মালী, তাই বোধহয় প্রকৃতিকে ভাবতেন এক সমৃদ্ধ বাগান। সেই বাগানের জমিতে তেমন বেশি না থাকলেও ভূগর্ভে আছে অজস্র জলধারা। মানুষ যদি যেমনটি দরকার, তেমন চেষ্টা করে তবে বাগানে ফুল ফোটানো যায়, ফল ফলানো যায়। এটি হতে পারে এক সুন্দর বাগান, স্বর্গের নন্দন কানন। কিন্তু তার জন্যে বিচার বুদ্ধির সঙ্গেই থাকতে হবে প্রয়াসকে। এদের বাদ দিলে প্রকৃতি হতে পারে মানুষের ধ্বংসের মাধ্যম। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ ইত্যাদির মত অস্ত্র তো সবসময়ই তৈরি হয়ে আছে মানবধ্বংসের জন্য। বিচারবুদ্ধি আর প্রয়াস দিয়েই মানুষ সে সব থেকে মুক্তি পেতে পারে।

ফুলে-র এইসব ধারণার ভিত্তি যে মহান ও চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধ, এ ব্যাপারটি স্পষ্ট। এই ধারণার বাহক হিসেবে যে ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন তা তীব্র আবেগে পূর্ণ। এমন এক অনুপ্রেরণা তাঁর লেখার মধ্যে কাজ করেছে যা যেমন অতীতের গভীরে ডুব দিচ্ছে তেমনই আবার ভবিষ্যতের অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে। ব্রাহ্মণদের ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মাধ্যমে ঘটানো অবিচার ও অত্যাচারে তিনি এতটাই ক্রুদ্ধ ছিলেন যে এদের একেবারে উল্টে ফেলে দিতে তিনি ছিলেন কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু এমন এক বিশাল কাজ করবার জন্য তাঁর উপকরণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অল্প। সমাজের যে স্তরে তিনি ছিলেন সে সময়, তা ছিল শিক্ষার ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাঁর রচনাও কখনও কখনও ইতর গালাগালির ভাষার প্রাধান্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁর ভাষা হয়েছে রুক্ষ ও অমার্জিত। সেজন্য সমাজের মেধাবুদ্ধিতে অগ্রসর মহলে তাঁর রচনার সমাদর হয়নি। প্রয়াত 'মহর্ষি' আন্নাসাহেব শিন্দে জ্যোতিবার ভাষাকে বলতেন বুনো ফল, যা তেমন রসাল নয় বটে, তবে ওষুধের গুণে পূর্ণ। পুরাকালীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে ফুলের আভাস-ইঙ্গিত ও সমাধান-সূত্রকে অনুসরণ করে আন্নাসাহেব শিন্দে, বি ডি যাদব এবং ডঃ আম্বেদকারের মত বিদ্বজ্জন ঐতিহাসিক গবেষণামূলক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

**উৎস**

Rationalists of Maharashtra
by N R Pathak, Tarkateertha Laxman Shastri Joshi and G P Pradhan - Indian Renaissance Institute.
Renaissance Publishers Pvt. Ltd December 1962 **উ মা**

# ভূপাল গণহত্যার নায়কদের বিচারের নামে প্রহসন

৮ জুন, ২০১০ কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্তির সামনে জড়ো হয়েছিলেন প্রতিবাদী মানুষ। এঁরা ভূপালে আমেরিকার রাসায়নিক কারখানা ইউনিয়ন কার্বাইডের গ্যাস দুর্ঘটনায় নিহত ২৫০০০ মানুষের হত্যাকারীদের বিচারের নামে প্রহসনের প্রতিবাদ করতে এসেছিলেন। ছ লাখের বেশি মানুষ মারণ গ্যাসে চিরজীবনের মতো পঙ্গু। আজও এদের ঘরে জন্ম নিচ্ছে বিকলাঙ্গ শিশু। ভূপালের গণহত্যার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ৮ জন ইউনিয়ন কার্বাইডের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মাত্র দু'বছর করে কারাদণ্ড ও কিছু অর্থদণ্ড দিল ভূপালের নিম্ন আদালত। প্রতিবাদে ফেটে পড়েন কলকাতার নাগরিক সমাজ। আর ছিল রেলিঙে ঝোলান প্রতিবাদী পোস্টার। প্রতিবাদের ধারাবাহিকতায় ১৫ জুন ২০১০ ধর্মতলা মেট্রো চ্যানেল থেকে মার্কিন দূতাবাস পর্যন্ত মিছিলে সামিল হয়েছিলেন নানান পেশার মানুষ ও সংগঠন।

# শরীরিণী-স্বৈরিণী: বারবনিতা, রাষ্ট্র, সমাজ

শাশ্বতী ঘোষ

বর্তমানে যৌনকর্মীদের পেশা সংক্রান্ত একটি মামলা কলকাতা হাইকোর্টে বিচারাধীন। ইম্‌মরাল ট্রাফিক প্রিভেনশন অ্যাক্টের (আই পিটিপিএ) কয়েকটি ধারার সংশোধনের দাবিতে যৌনকর্মীরা কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন। (আ. বা. ৫ই অগাস্ট ২০১০) বর্তমান আইন অনুযায়ী যৌনকর্মীর উপার্জনের টাকা মা, বাবা ও সন্তানেরা খরচ করতে পারবেন না। অন্যথায় পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করতে পারবে বা বিচারে দু'বছরের জেলও হতে পারে। অথচ যৌনকর্মীদের কাজটি স্বীকৃত বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্ট বিষয়টি বিচারের জন্য গ্রহণ করেছে এবং শীঘ্রই হয়ত রায়ও ঘোষিত হবে। এ এক অদ্ভুত সামাজিক অবস্থান যা ক্ষয়িষ্ণু সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বকে প্রকট করেছে। বর্তমান লেখাটি এ বিষয়ে সময়ানুগ আলোকপাত।

**সম্পাদকমণ্ডলী**

সুপ্রিম কোর্ট ২০০৯ সালে শিশু আর নাবালিকা পাচার নিয়ে বচপন বাঁচাও আন্দোলন আর চাইল্ডলাইন বলে দুটি অসরকারি সংগঠনের দায়ের করা দুটি পৃথক জনস্বার্থ মামলার রায় দিতে গিয়ে বলেছে সরকার যদি খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে নাই পারে, তাহলে কেন বারবনিতাদের পেশাকে বেআইনি করে রেখেছে? যদি নিয়ন্ত্রণ করা নাই সম্ভব হয়ে থাকে এতোসব চেষ্টার পরেও, তাহলে কেন বারবনিতাবৃত্তিকে আইনি করছে না? শুরু হয়েছে আবার নতুন বিতর্ক ...

বারবনিতাবৃত্তির স্বীকৃতির বিতর্কে প্রবেশের আগে মূল্যবোধ এবং শব্দচয়ন নিয়ে কিছু বলা জরুরি। শরীরকে শুচিতার আধার ধরে নিয়ে যৌনশুচিতার যে মাপকাঠি ('মেয়েরা মাটির ভাঁড়') শুধু মেয়েদের ওপর একতরফাভাবে চাপানো হয়েছে, তাকে এই নিবন্ধ নারীবিদ্বেষী বলে চিহ্নিত করছে। দ্বিতীয়ত, 'যৌনকর্মী' শব্দবন্ধটি সযত্নে পরিহার করে ব্যবহৃত হচ্ছে 'বারবনিতাবৃত্তিজীবিনী' এই শব্দবন্ধটি। সোনাগাছিতে বয়স্ক শিক্ষার ক্লাস নেওয়ার অভিজ্ঞতায় সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছিলেন, যৌনকর্মী শব্দবন্ধে ওই পেশার মেয়েদের কী তীব্র ঘৃণা ('যৌনকর্মী শব্দটা যেন তাদের জীবনটাকে আরও বেশি করে চিনিয়ে দিচ্ছে—'ওই কথাটার মধ্যে যৌন শব্দটা রয়ে গেছে যে।'... 'এখন নতুন নাম বেরিয়েছে—যৌনকর্মী। এটা আমার খারাপ লাগে। বেশ্যা বলার চেয়েও খারাপ লাগে।... যৌন ব্যাপারটা গোপন—কাপড়ে ঢাকা থাকে। লোককে দেখানো যায় না'': ব্রাত্যজীবনের বর্ণমালা, পৃঃ ৮৮)। তাই তিনি নিজে বারবনিতা শব্দটি চয়ন করেছেন। নিবন্ধকারের সীমিত অভিজ্ঞতা সন্দীপের অনুসারী। এছাড়া বারবনিতাবৃত্তি একটা পেশা, যে পেশার বাইরে তাঁদের একটা নিজস্ব ব্যক্তিপরিচয় আছে। এই পেশার মেয়েদের ব্যক্তি আর পেশা পরিচয়কে স্বতন্ত্র করতে শুধু 'বারবনিতা' শব্দের পরিবর্তে 'বারবনিতাবৃত্তিজীবনী'—এই শব্দটা ব্যবহার করা হল। এবং এই নিবন্ধে 'পেশা' আর 'বৃত্তি' সমার্থক।

আমাদের রাষ্ট্র তার আইন-বিচার প্রশাসনে পুরুষকেই প্রাধান্য দিয়েছে। নারী হবে সতী, হবে শুচি, হবে একগামী। নারীর সংজ্ঞা রাষ্ট্রের খতিয়ানে আসে কোনও পুরুষের ছত্রছায়ায় বা পরিচয়ে—স্ত্রী, কন্যা, মা, বোন। একক নারী রাষ্ট্রের সামনে একটি সমস্যাসঙ্কুল শ্রেণী বা ক্যাটিগরি—ভয়ঙ্কর রকমের সন্দেহভাজন। একক নারীর কোনও অধিকারের বিষয়ে রাষ্ট্রের অনীহার অন্যতম উদাহরণ, মা-কেও অভিভাবক বলে স্বীকার করার ক্ষেত্রে আইনি দীর্ঘসূত্রতা।

একক নারীর শ্রেণীতেও বারবনিতারা হলেন আর এক সমস্যার উৎস। শরীর বিক্রি করে তাঁরা একগামী যৌনতার লক্ষণের গন্ডিটি প্রকাশ্যেই অতিক্রম করেছেন। রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে তাঁরা হয় অপরাধী, নয়তো অনৈতিক—স্বাভাবিক নাগরিকের অধিকার থেকে তাঁরা তাই বঞ্চিত। সমাজের প্রয়োজনে রাষ্ট্র তাকে

জেলে পাঠাতে পারে, সংশোধানাগারে পুরে দিতে পারে, বাধ্য করতে পারে পাড়া ছাড়তে। বৈষম্য যে শুধু আইনে তা নয়, বৈষম্য আছে তার প্রয়োগেও। এমনিতেই দেখা যায় পুলিশ-প্রশাসন-বিচারব্যবস্থা দরিদ্র মানুষের প্রতি বিশেষ সদয় নয়, সমাজের নৈতিকতার অনুশাসনের জন্য বারবনিতাদের প্রতি তো আরও বিরূপ। আর এ বৈষম্য যে ন্যায়সঙ্গত, সেই বিশ্বাসকে ক্রমাগত পুষ্ট করছে ধর্ম-শিক্ষা-নৈতিকতা-মূল্যবোধ।

**মধ্যবর্তী যাঁরা**

গত দু দশকে বারবনিতাবৃত্তি নিয়ে ভাবনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। সেই পরিবর্তনের অনুঘটক একদিকে যেমন এই পেশার সঙ্গে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী, নারী ও মানবাধিকার আন্দোলনের তত্ত্ব, অন্যদিকে এই পেশার মেয়েদের অধিকারের দাবিতে একজোট হওয়া। তাই বদলে গেছে শুচিতার নৈতিক চশমা দিয়ে এই পেশাকে দেখা। দাবি উঠেছে অর্থের বিনিময়ে যৌনসংসর্গকে প্রয়োজনীয় শ্রম বা পরিষেবা হিসেবে এবং বারবনিতাকে পতিতা নয়, শ্রমিকের দৃষ্টিতে দেখার। স্বাস্থ্যের অধিকার এবং হিংসাবিহীন জীবনের অধিকারও তাই কাজের শর্তের আবশ্যিক অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন আলাপ-আলোচনায় বারবনিতাবৃত্তি নিয়ে নীচের বিষয়গুলি প্রস্তাবিত হয়েছে:

১. অর্থের বিনিময়ে যৌনতা বিষয়ক পরিষেবা সংক্রান্ত আলোচনা এবং সম্পাদন;

২. কোনও তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় অথবা মধ্যস্থতা ব্যতীত;

৩. বিজ্ঞাপন বা লোকশ্রুতির মাধ্যমে কোনও নির্দিষ্ট স্থানকে এই পরিষেবা প্রদানের জন্য চিহ্নিতকরণ;

৪. চাহিদা ও জোগানের মাধ্যমে এই পরিষেবার মূল্য নির্ধারণ।

এই প্রস্তাবের উত্থাপকদের মতে 'আলোচনা' শব্দটির প্রয়োগে এই পেশায় যাঁদের জোর করে বা প্রবঞ্চনা করে নিয়ে আসা হয়েছে, অর্থাৎ যাঁরা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা পাচার হয়ে এসেছেন, তাঁদের স্বেচ্ছায় আগতদের থেকে পৃথক করে দেওয়া হচ্ছে। এঁদের বক্তব্য—প্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষ স্বেচ্ছায় এই পেশায় এলে তাঁদের প্রতি আইন-রাষ্ট্র-সমাজের যে দৃষ্টিভঙ্গি হবে, যাঁরা পাচারের শিকার, তাঁদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির থেকে তা পৃথক হতে বাধ্য। তাঁরা স্বেচ্ছাধীন বারবনিতাকে বলছেন 'যৌনকর্মী', শরীরী আনন্দদানকে 'পরিষেবাক্ষেত্র', দালালকে 'ম্যানেজার'। এই অবস্থানের বিপরীতে যাঁরা আছেন, তাঁদের মতে—এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের মতো গরিব দেশে একেবারেই অচল। যেখানে কাজের সুযোগ নেই, অথবা সীমিত, সংসারকে দেখতে বা সন্তানকে ভরণপোষণ করতেই হবে, সেখানে কি ইচ্ছেটা আদৌ স্বেচ্ছাধীন? বরং এই পেশায় স্বীকৃতি কি দুর্নীতি-চোরাচালান-মাফিয়া-দালালচক্রকেই পুষ্ট করবে না? এমন কি আদর্শ অবস্থায় ধরে নিলাম, যাঁরা এসেছেন তাঁরা কেউই পাচার হয়ে আসেন নি, তা হলেও ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে পেশা হিসেবে এই কাজকে স্বীকৃতি দিতে হবে? নাকি পেশাটাকেই চিহ্নিত করা হবে অমানবিক বলে—যার কোনও ঠাঁই থাকবে না আদর্শ এক সমাজে?

অনেকে আবার দুটো পথের পদ্ধতি নিয়েই সংশয়ান্বিত। সংশয়ীদের মতে আইন পাল্টে স্বীকৃতি আসবে না—বাড়বে দালালদের অবাধ দৌরাত্ম্য। অন্যদিকে আবার আইন পাল্টে এই পেশার বিলুপ্তিও আসবে না—বাড়বে প্রশাসন আর নৈতিকতার ধারক-বাহকদের হাতে হয়রানি। তাহলে যাঁরা এই পেশাকে অমানবিক মনে করেন, একই সঙ্গে পুলিশ-গুণ্ডা-দালাল-মাসিদের দুষ্টচক্রের অবসান চান তাঁরা কি দাবি করবেন? মধ্যবর্তী পর্যায়টা কী হবে? তার আগে প্রথম ও দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আর একটু বিস্তারে যাওয়া যাক।

**মানবিক অধিকার বনাম শ্রমিকের অধিকার**

১৯৪৯ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘে চোরাচালান নিরোধ এবং বারবনিতাবৃত্তিতে নিযুক্তদের শোষণ বন্ধের সনদ গৃহীত হয়। ভারতীয় বারবনিতাবৃত্তি নিরোধ (সংশোধন করে পরে নিবর্তন) আইনটিও ১৯৫৬ সালে ওই সনদের ভিত্তিতে রচিত হয়। ভারতীয় আইনটির মূল সুর যতই রক্ষণশীল হোক না কেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদটির মূল সুর ছিল: ...'বারবনিতাবৃত্তি এবং তার সঙ্গে যুক্ত এই উদ্দেশ্যে পাচার মানুষের সম্মান আর মূল্যের সঙ্গে একেবারে বেমানান...' ('...incompatible with the dignity and worth of the human person...')। লক্ষণীয় এই যে, এই সনদে 'নারী' শব্দটি নয়, 'ব্যক্তি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। বারবনিতাবৃত্তিকে যাঁরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্ন বলে মনে করেন, তাঁরা বলছেন যে, প্রচলিত নারী-পুরুষ বৈষম্যভিত্তিক সমাজে শরীরের কেনাবেচায় একজন ক্রেতা (মূলত পুরুষ) এবং একজন বিক্রেতা (মূলত নারী) এখনই সমস্তরে, আজকের ভাষায় 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে' থাকতে পারে না। সেখানে বৈষম্য আর হিংসা প্রবেশ করতে বাধ্য। পরবর্তী অংশে এ বিষয়ে কিছু সমীক্ষার ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। অত্যাচার আর নির্যাতন বাদ দিয়ে, এই বৃত্তি শেখাচ্ছে যে নারীশরীর একটি পণ্য, অর্থের বিনিময়ে লভ্য। ফলে এর শিকার শুধু বিক্রেতা নারীটি নয়, ক্রেতা পুরুষটিও। সে জানছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পণ্যটি তার ব্যবহার্য, যথেচ্ছ ব্যবহার, আঘাত করা এবং ব্যবহারের শেষে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেবার মালিক ক্রেতাটি। অর্থাৎ তীব্র নারীবিদ্বেষ আরও আরও গভীরে তার শিকড় সঞ্চারিত করছে। এই ভাবনার বিস্তারের ফলে বাড়ছে নারীর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতন, কাজের জায়গায় যৌনহেনস্থা এবং নারী-পুরুষের গভীরতম সম্পর্কেও প্রবেশ করছে হিংসা। বারবনিতাপল্লীর

শিশুরা শিকার হচ্ছে আরও গভীর অবক্ষয়ের। গবেষক আন্নাম সুরেশ দেখছেন যে, এইসব শিশুরা কোনও সম্পর্ককে সম্মান দিতে শেখে না—কারণ এরা দেখে কেবল শরীরের বিনিময়েই জীবনযাপনের জিনিসগুলি আসছে। তাঁর মতে, এদের শেখানো দরকার যে, কোনও কিছু পেতে হলে শরীর না দিলেও চলে।

বারবনিতাবৃত্তিকে 'শ্রম' বলে স্বীকৃতি দেবার দাবিদার কম নয়। বিশেষত বিশ্ব শ্রমসংস্থার ১৯৯৮ সালের একটি রিপোর্ট (দ্য সেক্স সেক্টর: দ্য ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল বেসেস অফ প্রস্টিটিউশন ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া, জেনিভা) বারবনিতাবৃত্তিকে শ্রম হিসেবে স্বীকৃতি দেবার দাবি তুলে প্রচণ্ড বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। ওই রিপোর্টে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, তাইল্যান্ড আর ফিলিপাইন্সের দেশভিত্তিক গবেষণা করে এবং এ সমস্ত দেশের অর্থনীতি তথা জাতীয় আয়ে বারবনিতাবৃত্তিজাত আয়ের হিসেব করে এই বৃত্তিকে 'সেক্স সেক্টর' (যৌনক্ষেত্র?) বলে স্বীকৃতি দেবার সুপারিশ করেছে। এই পেশার ক্রমবর্ধমান বিস্তারকে স্বীকৃতি দিয়ে এই ক্ষেত্রে কর্মরত মেয়েদের শ্রমিকের অধিকার এবং সুবিধা দেবার কথা উঠেছে। প্রস্তাব হয়েছে এদের আয়ে কর আরোপ করবার।

শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি এবং শ্রমিকের অধিকারের দাবি অবশ্য বিশ্ব শ্রম সংস্থার রিপোর্টের অনেক আগে থেকেই উঠেছিল। ১৯৮৫ সালের আমস্টার্ডামে বারবনিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত মেয়েদের আন্তর্জাতিক দাবিসনদ প্রকাশিত হয়। এর মূল চারটি দাবি হল:

(ক) বয়ঃপ্রাপ্ত এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে এই বৃত্তিতে এসেছে এরকম কোনও ব্যক্তিকেই অপরাধী বলে চিহ্নিত করা চলবে না।

(খ) বারবনিতাবৃত্তিকে অপরাধমুক্ত করে (অর্থাৎ অপরাধী বলে চিহ্নিতকরণ বন্ধ করে) তৃতীয় ব্যক্তির (দালাল/মাসি) ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এই পেশার আচরণবিধি চালু করতে হবে।

(গ) ঠকানো বাধ্য করা, হিংসা, শিশু-যৌননিপীড়ন, শিশুশ্রম, ধর্ষণ এবং বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আইনকে প্রয়োগ করতে হবে।

(ঘ) বারবনিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত মেয়েদের নিজস্ব সংগঠনের অধিকার, দেশের মধ্যে এবং বিদেশেও ইচ্ছেমত ভ্রমণের অধিকার থাকবে—তাঁদেরও একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে তা স্বীকার করে নিতে হবে।

পরবর্তীকালে এই যুক্তি আরও পুষ্ট হয়েছে। দাবি উঠেছে, ১৯৪৯ সালের রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদটিকে বাতিল করবার—কারণ তাতে বারবনিতাবৃত্তি আর মেয়ে পাচারের মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য করা হয় নি। এই সনদের স্বেচ্ছায় এবং অনিচ্ছায় আসা মেয়েদের একই পঙ্‌ক্তিতে রাখবার বিরুদ্ধে সরব শ্রমিক অধিকারের দাবিদার গোষ্ঠীগুলি। ওই সনদটি থাকার ফলে শ্রমিকের অধিকারের স্বীকৃতি পাওয়া অসুবিধে হয়ে গেছে। শ্রমিক অধিকারের দাবিদার গোষ্ঠীগুলির মতে সবাই মোটেও বাধ্য হয়ে এই পেশায় আসেন না। এই পেশায় আসার পর কাজের পরিবেশ বা শর্তও সবার জন্য একরকম থাকে না—অনেকেই নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

অনেকে আবার আরও এগিয়ে বলেছেন যে, বারবনিতারা তাঁদের শরীর, আয় এবং যৌনতার মালিক। তাঁরা অনেকেই নির্যাতনকারী স্বামীর ঘর ছেড়ে এসে নির্যাতনকে অতিক্রম করতে পেরেছেন। নারী-পুরুষ সম্পর্ককেও তাঁরা নিজেদের শর্তে নতুন করে সাজাতে পেরেছেন। সেই স্বাতন্ত্র্য 'ঘরবনিতা'রা কখনওই পান না। তাঁদের এই স্বাতন্ত্র্যকে পুরুষতন্ত্র ভয় পায় বলেই নৈতিকতার (বা এখন মানবিকতার) ধূয়ো তুলে এই পেশার স্বীকৃতির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা হচ্ছে। যেমন ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হিদার ডেল কলকাতার বারবনিতাপল্লীতে সমীক্ষা করে ক্ষমতায়নের একটা চিত্র হাজির করেছেন। তাঁর সমীক্ষার ৬০% মেয়ে দাম্পত্য নির্যাতনের হাত থেকে পালাতে এই পেশায় এসেছেন; ৪০% এসেছেন দারিদ্র্যের হাত থেকে বাঁচতে, অনেকেই বাড়িতে পয়সাও পাঠান। অর্থাৎ বারবনিতারা শুধু বঞ্চনার শিকার, এটি কাহিনীর একটি দিক মাত্র। অন্যদিকে আছে এই পেশাকে ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের, ক্ষমতাকে ভোগ করার সুযোগ। বর্মা বা মায়ানমারের মেয়েরা দেখেছে দেশে মিলিটারি তাদের শরীরকে ভোগ করবে বিনা পয়সায়। তাই তাঁরা স্বেচ্ছায় থাইল্যান্ডে গিয়ে বারবনিতাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে নিয়েছেন। শরীরের অধিকার যখন থাকবেই না, তার বিনিময়ে অন্তত অর্থ আসুক—এই তাঁদের যুক্তি। প্রশ্ন হল—এটা কি সত্যিই ক্ষমতায়নের প্রকাশ? একটি অমানবিক পেশা যদি কোনও সুবিধা দেয়ও সেটাকে কি কাম্য বলে গ্রহণ করতে হবে?

### 'অকুপেশনাল হ্যাজার্ড'

সমাজটা যদি আদর্শ সমাজ হত, যদি নারী-পুরুষ, সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু, শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গ, অগ্রসর-অনগ্রসর গোষ্ঠীর মধ্যে বৈষম্য না থাকত, তা হলে পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইচ্ছে-অনিচ্ছেয় সে সত্যিই একটা ভূমিকা আছে তা মেনে নেওয়া যেত। সে-সমাজে তো অপরাধ বা অপরাধী থাকার কথা নয়, থাকার কথাও নয় জেল-পুলিশ-অস্ত্র-ব্যবসায়ী-সেনাবাহিনী। কিন্তু সেরকম সমাজ না হলে স্বেচ্ছায় বৃত্তি নির্বাচনের প্রশ্নটি কতটা যুক্তিসঙ্গত? দেশে তো বটেই বিদেশেও অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসর গোষ্ঠীর মেয়েরাই এই পেশায় সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমেরিকায়—কালো আর হিস্পানিক। ইউরোপে—পূর্ব ইউরোপের বা প্রাক্তন সোভিয়েত ব্লকের মেয়েরা। এদেশেও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মেয়েরাও আছেন

বেমানান অনুপাতে। আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা এই পেশায় যাবে না জেনেই অন্যদের জন্য পেশা নির্বাচনের স্বাধীনতার ওকালতি করব না কি?

তর্কের খাতিরে না হয় ধরেও নিলাম যে বাজারের চাহিদা সত্ত্বেও এই পেশাতে নাবালিকাদের আগমন সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব হল। তা হলেও কি বাকিদের জন্য 'অন্য যে কোনও একটি পেশা' বলে এই পেশাকে চিহ্নিত করব? সমস্ত সমীক্ষা বলছে এই পেশার শারীরিক আর মানসিক চাপ অসহ্য, সেগুলিকে কি চিহ্নিত করব 'পেশাগত সমস্যা' (occupational hazards) বলে? বারবনিতাবৃত্তি এতটাই অমানবিক একটি পেশা যে হিংসা সেখানে নিত্যসঙ্গী। অধিকাংশ সমীক্ষা বলছে বহু একক-পুরুষ সঙ্গিনীর খোঁজে এলেও বহু খদ্দের আসে প্রচলিত সামাজিক সম্পর্কে যে - বিকৃত কামাচার তারা দাবি করতে পারে না, তার খোঁজে। অর্থাৎ বান্ধবী প্রেমিকা বা স্ত্রীর কাছে তারা যা পায় না, পয়সা দিয়ে তাই কিনতে। আর আসে মাঝবয়সিরা। ফলে অধিকাংশ বারবনিতা শিকার হন শারীরিক হিংসার। এই পেশার মানসিক চাপ নিতে না পেরে প্রায় অধিকাংশই নেশার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। অধিকাংশ বারবনিতা ভোগেন যোনিদ্বার আর জরায়ুর প্রদাহে, ক্রমাগত তীব্র যন্ত্রণায়, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভ আর গর্ভপাত থেকে। মাদকসেবনও কমাতে পারে না তাঁদের মানসিক অসুস্থতার রোগলক্ষণ: অবসাদ নিদ্রাহীনতা, তীব্র বিরক্তি। ক্রমাগত দুঃস্বপ্ন আর ফ্ল্যাশব্যাক। এই চিহ্নগুলিকে সামগ্রিকভাবে মনোবিশেষজ্ঞরা পোস্ট-ট্রমাটিক-স্ট্রেস ডিসঅর্ডার বলছেন। বারবনিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত কত মেয়ে এই উপসর্গের শিকার তা কেউ জানে না, কারণ সেই গবেষণা প্রায় অসম্ভব। হয়েছে বড়জোর কিছু নমুনা পরীক্ষা—তাই যথেষ্ট ভয়াবহ।

৪৭৫ জন বারবনিতাকে নিয়ে ১৯৯৮ সালের একটি সমীক্ষা বলছে যে, ৭৩% শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ করেছেন, ৬২% বলেছেন যে তাঁরা ধর্ষিতা হয়েছেন, অর্থাৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যৌনসংযোগে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। ৪৬% বলেছেন অন্তত পাঁচবার তাঁরা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। মনে রাখতে হবে ওই ৪৭৫ জনের নমুনা কিন্তু ভারতের মতো দরিদ্র দেশ থেকে আসে নি। দক্ষিণ আফ্রিকা, জাম্বিয়া আর তুরস্কের সঙ্গে নমুনা এসেছে থাইল্যান্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকেও, যেখানে 'হেল্পলাইন' ব্যবস্থা অনেক উন্নত। এঁদের মধ্যে ৬৭% ভুগেছেন পোস্ট-ট্রমাটিক-স্ট্রেস ডিসঅর্ডার-এ। দেশ নির্বিশেষে হিংসার চেহারা আশ্চর্যরকমের এক।

হিংসার এই পরিমণ্ডলে কীভাবে সম্ভব শ্রমিকের অধিকার সুনিশ্চিত করা? খদ্দেরকে আচরণবিধি শেখানো? যেখানে পেশার আয়ু তিরিশ বছর বয়ঃসীমা পর্যন্ত, সেখানে খদ্দের যন্ত্রণাদায়ক বিকৃত আচরণ দাবি করলে প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন কোন্ বারবনিতা? কার ভরসায়? বিশেষত আমাদের মতো দরিদ্র দেশের কোনও খদ্দের কন্ডোম ব্যবহার না করাতে পাশের কামরার প্রতিযোগী বারবনিতাটি যদি সেই শর্তে সম্মত হয়ে যান? কিন্তু সেই সঙ্গে খদ্দেরকে অনুরোধ করেন সে তথ্য গোপন রাখতে? কী করে পাওয়া যাবে প্রকৃত তথ্য? বারবনিতাদের সংগঠনের এসব সংক্রান্ত দাবি নিয়ে অনেকের অনেক প্রশ্ন আছে, যেমন স্বতন্ত্রভাবে মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে না পারার অভিযোগও বিস্তর।

এড্‌সের ভয়াবহতা এই প্রান্তিকীকরণকে আরও জোরদার করেছে। যদিও দেখা গেছে পুরুষ খদ্দেররাই এড্‌সের ধারক এবং বাহক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এড্‌স ছড়ানোর নৈতিক দায়টা এসে পড়ছে বারবনিতাদের উপরেই। অথচ তাঁরা খদ্দেরকে কন্ডোম ব্যবহারে বাধ্য করতে পারেন না, জীবনসংশয় হতে পারে জেনেও কন্ডোমবিহীন বিপজ্জনক যৌনসংযোগে তাঁরা বাধ্য হন। এড্‌সের হুজুগ বারবনিতাদের আরওই বিপন্ন করে তুলেছে। সাধারণ মেয়েদের তুলনায় এমনিতেই এই মেয়েদের প্রত্যাশিত আয়ু কম। যেমন কানাডার মতো দেশে বারবনিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত মেয়েদের মৃত্যুর হার ছিল জাতীয় গড়ের প্রায় চল্লিশ গুণ বেশি, যদিও যেখানে সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা অভাবনীয় রকমের উন্নত। এই শারীরিক বিপন্নতা এড্‌সে আরও বেড়েছে।

সাধারণ মেয়েদের তুলনায় বারবনিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত মেয়েদের মধ্যে এড্‌সে আক্রান্ত হবার হার প্রত্যাশিতভাবেই বেশি (যদিও চিত্রটা বদলাচ্ছে)। মুম্বাইয়ের বারবনিতাপল্লী থেকে উদ্ধার হওয়া ২১৮ জন মেয়ের মধ্যে দেখা গেছে ৬৫% এড্‌সে আক্রান্ত। মায়ানমার থেকে চোরাচালান হওয়া মেয়েদের ৫০% থেকে ৭০%,উত্তর থাইল্যান্ডের ৩৪% কাম্বোডিয়ার প্রায় ৫০% বারবনিতা এড্‌সে আক্রান্ত। এমনকী তথ্য-অভিজ্ঞ পশ্চিমি দেশেও বারবনিতাদের এড্‌সে আক্রান্ত হবার হার অনেক বেশি। ইতালিতে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৮ এই এক দশকে বারবনিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত মেয়েদের মধ্যে এড্‌স সংক্রমণের হার ২% থেকে বার্ষিক ১৬% হয়েছে। একেও কি আমরা বলব অকুপেশনাল হ্যাজার্ড?

**প্রাপ্তবয়স্কের স্বেচ্ছাবৃত্তি**

ইচ্ছায় কারা এসেছেন, আর কারা এসেছেন অনিচ্ছায়? আমাদের মতো দেশে এই দেওয়ালটা কি আদৌ টানা যায়? প্রথমত, যাঁরা স্বেচ্ছায় এসেছেন, তাঁরাও হয়তো দারিদ্র্য, জীবনজীবিকার সঙ্গতিহ্রাস, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা সশস্ত্র সংঘর্ষের শিকার ইত্যাদি নানা কারণেই এই পেশায় আসতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এই দেওয়ালটা টানা হলে তাঁরা আর কোনওদিনই আইনি সুরক্ষার সুযোগ পাবেন না। কোনওদিনই আর আইনের আওতায় আনা যাবে না সংশ্লিষ্ট দালাল-মাসিদের। দ্বিতীয়ত, যাঁরা অনিচ্ছায়

এসেছেন, তাঁরাও তো অত্যাচার বা প্রবঞ্চনা প্রমাণ করতে না পারলে আইনের সহায়তা পাবেন না। এই পেশার মানুষদের কাছাকাছি যাঁরাই কাজ করেছেন, তাঁরাই জানেন এখানে মাফিয়াচক্র এত জোরদার এবং মুনাফা এত বেশি যে, সে সমস্ত গোপন করে স্বেচ্ছায় আসবার নানা সাক্ষ্য নির্মাণ করিয়ে নিতে পারবে। খদ্দেরের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি তুলতে বাধ্য করতে পারবে। পারবে সে ধরনের স্বীকারোক্তি আদায় করতে। তৃতীয়ত, বারবনিতাবৃত্তি বনাম পাচার, স্বেচ্ছায় আসা বনাম অনিচ্ছায় আসা—এই বিভাজন কি আবার সেই পুরনো খারাপ মেয়ে বনাম ভাল মেয়ের দ্বন্দ্বটাকেই ফিরিয়ে আনছে না? আর যাঁরা অনিচ্ছায় এসেছিলেন কিন্তু প্রমাণ করতে সমর্থ হন নি বারবনিতাদের অধিকারের লড়াইটা কি তাঁদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না?

এই পেশাকেও অন্য যে কোনও পেশার মতো একটি স্বেচ্ছাবৃত পেশা বলে চিহ্নিত করলে পরিবর্তন আনতে হবে শ্রমনীতিতে। পাঠ্যসূচিতে। কারণ তখন এটিও হবে 'অন্য যে কোনও' পেশার মতো একটি পেশা। কর্মশিক্ষার কেন্দ্রগুলি, যেমন আই টি আই-গুলিতে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করতে হবে। যেমন, পরিবর্তন আনতে হবে শ্রমনীতিতেও। বামফ্রন্ট করে নি, পরিবর্তনের হাওয়া কি সেই বদল আনবে? সরকার যদি সত্যিই এই পেশার মেয়েদের দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, তবে নিশ্চয় ধোঁয়াশা না রেখে এ সমস্ত বিষয়েই স্পষ্ট নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

আসলে আইনি স্বীকৃতির দাবিতে কোনও না কোনও চেহারায় সম্মতি দেওয়াতে তৃতীয় দুনিয়ার অনেক গরিব দেশেরই বেশ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। বিশ্বায়নের যুগে এমনিতেই মন্ত্র হচ্ছে সরকার তার দায়িত্ব কমাবে, কমাবে ভরতুকি। সুতরাং অন্য কাজ না পেয়ে স্বনির্ভর হতে কিছু মেয়ে যদি যৌন পরিষেবা বিক্রি করে, সরকারের নীতিগতভাবে তাতে আপত্তি নেই। যেমন ছোট দেশ বেলিজের (পূর্বতন ব্রিটিশ হন্ডুরাস) সরকারি প্রতিনিধি চতুর্থ আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলনের মূল্যায়নকারী 'বেজিং-প্লাস-ফাইভ' সম্মেলনে (২০০০) এসে গর্বের সঙ্গে জানিয়ে গিয়েছেন: বেলিজে বারবনিতাবৃত্তিকে বিশেষভাবে নারীর জন্য এক ধরনের ভ্রাম্যমাণ (migrant) শ্রম বলে স্বীকার করা হচ্ছে, যা প্রায়শই অধিক অর্থকরী, যেমন কৃষিশ্রম পুরুষ শ্রমিকদের অর্থনৈতিক কাজের সুযোগ করে দেয়।

**পিটা : নানা সমস্যা**

পিটা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের অনুসারী হলেও এর মূল সুর খুবই রক্ষণশীল। ১৯৫৬ সালে সাপ্রেসন অফ ইমমর‍্যাল ট্রাফিক ইন উইমেন অ্যান্ড গার্লস কার্যকর হল। ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬ সালে সংশোধন হওয়া সত্ত্বেও এর কার্যকারিতা প্রশ্ন সাপেক্ষ। এই আইন ছাড়া ভারতীয় দন্ডবিধির এই সংক্রান্ত বহু ধারা নিয়ে প্রশ্ন আছে, প্রশ্ন আছে নাবালিকার সংজ্ঞার অস্পষ্টতা নিয়েও। সেই আলোচনা এই পরিসরে সম্ভব নয়। এ সমস্ত ধারা প্রণয়নের সময় একটা কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, হয়তো বা ছিল বারবনিতাদের প্রতি অনুকম্পামিশ্রিত করুণাও। কিন্তু এগুলো শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমত, পিটা বারবনিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত মেয়েদের পরিবারের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়, বারবনিতাদের সঙ্গে কোনও নাবালিকা বসবাস করলে তাকে পুলিশ মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন করে হোমে পাঠাতে পারে। কারণ ধরেই নেওয়া হবে যে মেয়েটিকে প্রকৃতপক্ষে বারবনিতাবৃত্তিতেই নিয়োগ করা হবে। ওই মেয়ের স্বামী, বাবা-মা বা কোনও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তান তার উপার্জনে খেলে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা করতে পারে। সামাজিক নৈতিকতার পক্ষে বারবনিতাকে বিপজ্জনক মনে করলে রাষ্ট্র প্রশাসন তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে এবং নিজস্ব থানা এলাকা থেকে বহিষ্কার করে দিতে পারে।

বারবনিতাকে নৈতিকভাবে 'পতিত' বলে মনে করায় মেয়েরা যে অসংখ্য কারণে এই পেশায় আসে, যেমন ধর্ষণ, যৌননিপীড়ন, প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে, আত্মীয়দের দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে, সশস্ত্র সংঘর্ষের বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে, সে সম্বন্ধে এই আইন সম্পূর্ণ নীরব। বরং আইনের চোখে সবাই সমান - আধুনিক পৌরসমাজের এই ধারণাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এখনও বজায় থাকে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১৫৫ (বি) ধারা। এই ধারা-বলে কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে যে, ধর্ষণের অভিযোগ আনয়নকারিণীর চরিত্র 'সন্দেহজনক', তা হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তার সাক্ষ্য গৃহীত হবে না। 'সন্দেহজনক' চরিত্র হল একগামী নয় তা প্রমাণ করা। অর্থাৎ নারীর ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য হবার নাগরিক অধিকার সার্বিক নয়, তার একগামিতার ভিত্তিতে খণ্ডিত। তাই বারবনিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত মেয়েরা খদ্দেরের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনতে পারেন না। রাষ্ট্রের আইন অনুশাসন দিয়েছে, অর্থের বিনিময়ে শরীর বিক্রি করে বারবনিতা একগামিতার লক্ষ্মণের গন্ডি অতিক্রম করেছে। সুতরাং রাষ্ট্রের সুরক্ষা তার জন্য নয়, তা সে যতই যৌন নিপীড়নের শিকার হোক না কেন।

১৯৫৬ সালে সাপ্রেসন অফ ইমমর‍্যাল ট্রাফিক ইন উইমেন অ্যান্ড গার্লস কার্যকর হল। ১৯৭৮ এবং ১৯৮৬ সালে সংশোধন হওয়ার পর আবার ২০০৬ সালে এই আইনের সংশোধন প্রস্তাবিত হয়েছে। এবারের সংশোধনের মূল বিষয়গুলি হলো: (১) শরীরকে বাণিজ্যিকভাবে যৌন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পাচারকে গণ্য করা হবে (২) বারবনিতাদের নয়, তাঁদের খদ্দেরদের শাস্তি হবে, ধরা পড়লে (৩) সমস্ত অভিযোগ গোপনে, লোকচক্ষুর আড়ালে

বিচার হবে, (৪) বারবনিতাবৃত্তির উদ্দেশ্যে পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়লে যে কোনো ব্যক্তিই শাস্তি পাবে, (৫) কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে পাচার মোকাবিলা করার জন্য নতুন একটি সংস্থা গঠিত হবে।

এই প্রস্তাবের প্রচুর সমালোচনা হয়েছে পক্ষে-বিপক্ষে দুদিকেই জোরালো মত রয়েছে। বিরোধীরা বলছেন: ক) বারবনিতাবৃত্তি অপরাধ নয়, কিন্তু বারবনিতালয়ে তা করা অথবা কোনো প্রকাশ্য স্থানের ২০০ মিটারের মধ্যে তা করা অপরাধ, তাহলে স্ব-ইচ্ছায় যাঁরা বারবনিতাবৃত্তি করে উপার্জন করছেন, তাঁদের উপার্জন বৈধ না অবৈধ তা স্পষ্ট হচ্ছে না। খ) খদ্দেরদের শাস্তি দিলে এই পেশা আরোই গোপনীয়তার আশ্রয় নেবে, আরোই লুকিয়ে পড়বে, তাহলে যারা সত্যিই পাচারের শিকার হয়ে এসেছে, তাদের আইনি সহায়তা দেওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। গ) বারবনিতাবৃত্তির জন্য পাচার অপরাধ, কিন্তু বন্ধুরা মজদুর বানালে বা ঘরের কাজের জন্য আনলে তাদের পাচার বলে ধরা হবে না। ঘ) এই অপরাধের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব যে বিশেষ পুলিশ অফিসারের উপর দেওয়া থাকবে, তাদের এখন ইন্সপেক্টর নয়, সাব ইন্সপেক্টর হলেই চলবে। রূপায়ণের দায়িত্ব যত নিচের দিকের পুলিশদের দিকে থাকবে, ততই পাচারের শিকার যারা, তারা হয়তো বৈষম্যের শিকার হবেন, ঙ) বিশেষ নতুন সংস্থার কোনো রূপরেখা নির্দিষ্ট করা হয় নি। এই বিল নিয়ে আলোচনা -তর্ক-বিতর্ক এখনো চলছে।

পিটা অসম্পূর্ণ। তা বলে কি আমরা তার অবলুপ্তি চাইব? এই আইন প্রণয়ন এবং সংশোধনের পেছনে ভারতীয় মেয়েদের লড়বার দীর্ঘ ইতিহাস আছে। সে তো পণ-নিবারণী আইনে এখনও কারও সাজা হয় নি। ৪৯৮ ধারায় এ সম্বন্ধে 'অপব্যবহারের' অভিযোগ ভূরি ভূরি। সতী নিবারণী আইন সত্ত্বেও রূপ কানোয়ারের সতী হবার মামলায় ৩৫ জন অভিযুক্ত প্রত্যক্ষদর্শীর অভাবে খালাস পেয়ে গেছে। ধর্ষণের মামলায় প্রকাশ্য আদালতে শুনানির সময় ধর্ষিতার হয়রানি এড়ানোর জন্য গোপন শুনানি চেয়েছিল নারী সংগঠনগুলি। আজ দেখা যাচ্ছে সেই দাবিই ধর্ষিতার বিরুদ্ধে চলে গেছে। গোপন শুনানির সময় অভিযুক্তের উকিলরা যথেচ্ছ প্রশ্ন করে হয়রান মেয়েটিকে আরও হয়রানি করতে পারছে, কিন্তু ধর্ষিতার সপক্ষের সহমর্মী নারী বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা সেখানে উপস্থিত থাকতে পারছেন না। কিন্তু নারী সংগঠনগুলি এগুলোর কোনওটার বিলুপ্তি দাবি করেন নি, দাবি করেছে কার্যকর করে তোলার মতো সংশোধন। তা হলে আমরা কেন পিটা বিলোপ করতে চাইব? কেন বলব না বাঙ্গালোর ল স্কুলের মাধব মেনন বা দিল্লির সেন্টার ফর ফেমিনিস্ট লিগাল রিসার্চ যে সমস্ত সংশোধন প্রস্তাব করেছে আইন কমিশনের কাছে, সেগুলি বিবেচিত হোক।

**খারাপ মেয়ে ভাল মেয়ে**

আইন বা প্রশাসন অনেক কিছু পারে, কিন্তু যেখানে প্রশ্নটা মূল্যবোধের সেখানে তাদের ভূমিকা একেবারে শূন্য। ভাল-মেয়ে খারাপ-মেয়ের ধারণাটা এরকমই গভীরে প্রোথিত এক বোধ। নারীর শরীর সন্তান ধারণ করে। সমাজে উত্তরাধিকার মূলত পুরুষদের মধ্য দিয়েই নির্ণয় করা হয়। তাই পুরুষের উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে নিঃসংশয় হতে প্রয়োজন নারীর যৌনজীবনে শৃঙ্খলা আরোপ। আইনের অনুশাসন ছাড়াও সেই শৃঙ্খলা সঞ্চারিত হয় ধর্ম, মূল্যবোধ এবং প্রচলিত অতিকথনের মাধ্যমে।

এরকমই একটি অতিকথন হল, প্রাকৃতিক নিয়মে পুরুষের অতিরিক্ত কামতাড়নার গপ্পো। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে কামতাড়না নারী-পুরুষ নির্বিশেষে উপস্থিত থাকে। মেয়েরা 'ভাল মেয়ে' হবার সামাজিক চাপে তা গোপন করতে শেখে। বিপরীতে পুরুষ আশৈশব শেখে যে শরীরকে ব্যবহার করতে জানা পৌরুষেরই অংশ। অর্থাৎ যৌনতার বোধ যত না শারীরবৃত্তীয়, তার থেকে অনেক বেশি সামাজিক নির্মাণের ফসল। আর পুরুষের অনিঃশেষ কামতাড়নার অতিকথনটা ধরা পড়ে। যখন পড়ি যে ভায়গ্রা সফল হবার জন্যও প্রয়োজন 'ফোরপ্লে'-র।

এই অতিকথনের অনুসারী হল বারবনিতারা না থাকলে 'ভাল' মেয়েরা অহরহ ধর্ষণের শিকার হত। প্রথমত, অধিকাংশ ধর্ষণের ঘটনা ঘটে অপরিচিত পুরুষ নয়, পরিচিত, এমনকী পরিবারের মধ্যেও। দ্বিতীয়ত, সেখানে কাজ করে ক্ষমতার প্রদর্শন, কামের প্রকাশ নয়। আর এই অতিকথনের আর একটি দিক হল এই পেশা সম্বন্ধে 'আদিমতম' বিশেষণটির প্রয়োগ, যেন নারী চিরকাল স্বভাবত শরীরকেই বিনিময়ের মাধ্যম করে এসেছে। বাস্তবে তো সমাজে উদ্বৃত্ত তৈরি না হলে এই পেশার উদ্ভব সম্ভব নয়। যখন সুপ্রিম কোর্টও সেই বিশেষণ ব্যবহার করে, তখন হতাশ হওয়া ছাড়া আর পথ থাকে না।

**'লাথি মেরে চলে যাব'**

মূল্যবোধ বদলালেও কি মেয়েরা এই পেশায় থাকতে চাইবেন? গয়ার বারবনিতাপল্লীর ৫২% মেয়ে বলছেন যে তাঁরা তাঁদের মেয়েদের এই পেশায় পাঠাতে চান না, শুধুমাত্র বিকল্প নেই বলে বাধ্য হচ্ছেন। আসলে রাষ্ট্র যতক্ষণ 'পতিতাদের' উদ্ধার করার মনোভাব নিয়ে পুনর্বাসন দিতে চাইছে, তা কখনওই বিকল্প জীবন নয়। বিকল্পটা আন্তরিক হওয়া চাই, দায়সারা নয়। নারী কমিশনের প্রাক্তন সভানেত্রী মোহিনী গিরি বলেছেন যে, সারা ভারতে যে দু লক্ষ বারবনিতার সঙ্গে তাঁর কথা বলা সম্ভব হয়েছে, তাঁরা সবাই বিকল্প চেয়েছেন। কেরালার তিরুবনন্তপুরমের বারবনিতারা নারী কমিশনের দেওয়া প্রশিক্ষণ নিতে অস্বীকার করেন—কারণ শিল্প প্রশিক্ষণকেন্দ্রে সারা দিন থেকে তাঁরা মাসে পাঁচশো টাকা পাবেন,

যেখানে তাঁদের দৈনিক আয় ৩০০ টাকা। আবার ভুবনেশ্বরের মালিশাহির মেয়েরা সমবায় ভিত্তিতে একটা চালকল বসাতে চেয়েছেন, যেখানে তাঁরা প্রত্যেকেই মাসে ২৫০০ টাকা উপার্জন করতে পারবেন। প্রশ্নটা টাকার পরিমাণের নয়, দৃষ্টিভঙ্গির। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাঁরাও অংশীদার হবেন।

শুধু যে ভারতীয় মেয়েরা রক্ষণশীল বলে বিকল্প জীবন চান তা নয়। পাঁচ দেশের বারবনিতাদের নিয়ে পূর্বোক্ত সমীক্ষা দেখাচ্ছে যে, ৯২% এই পেশা ছাড়তে চান, ৭২% চান আশ্রয়, ৭০% নতুন পেশায় প্রশিক্ষণ। পশ্চিমবঙ্গের বারবনিতাদের নিয়ে কর্মরত দাতা সংস্থারা যখন বিকল্পের বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন, টাকা ঢালেন কন্ডোম-পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন পরিবৃত নিরাপদ যৌনসংসর্গে, প্রশ্ন ওঠে অধিকারের নামে তাঁরা এই পেশাতেই মেয়েদের সুস্থিতি চান কিনা। মজা হল যে, ইংরেজ এবং মার্কিন দাতা সংস্থাগুলি কিন্তু নিজের নিজের দেশে আইনিকরণ নিয়ে চুপ। অথচ বিদেশেও শুধু হল্যান্ড এই পেশা আইনি করেছে, আর জার্মানি চিন্তা করছে। বিপরীতে সুইডেন খদ্দেরদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিতে আইন করেছে—অর্থাৎ তারাও এই পেশাকে কাম্য বলে মনে করছে না। কিন্তু এ দেশে সেই দাবির পেছনে এসে দাঁড়াচ্ছে দাতা সংস্থাগুলি। এটা কি বিশ্বায়নেরই আর একটি চেহারা?

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বয়স্ক শিক্ষার ক্লাসের যে মেয়েটি এই পেশাকে লাথি মেরে চলে যেতে চেয়েছিলেন, তাঁর পাশে তা হলে কে দাঁড়াবে? তাঁর দরকার আইনি পরামর্শ। চোরাচালানকারি বা দালালকে চিহ্নিত করলে সুরক্ষা। সেজন্য দরকার আইন এবং বিচার ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো। প্রয়োজনে নতুন আইন। মাসি এবং খদ্দেরদের দায়িত্ব চিহ্নিত করা। তাঁর আরও প্রয়োজন আয়/সাময়িক আশ্রয়/পরামর্শ/বিনা মূল্যে এবং গোপনে চিকিৎসার ব্যবস্থা। তাঁর মানবিক এবং নাগরিক অধিকারের জন্য লড়তে দায়বদ্ধ আইনজীবী। নেশা ছাড়ানোর ব্যবস্থা। শিশুদের শিক্ষা। নিজের শিক্ষা আর প্রশিক্ষণ। দীর্ঘকালীন আবাসন। এক ভিন্ন মূল্যবোধ। এক বিকল্প জীবন। কে নেবে সেই দায়িত্ব? সরকার? স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন? বেসরকারি সংস্থা? যাঁরা বারবনিতাদের মঞ্চে দাঁড়িয়ে মেধা বিক্রি আর শরীর বিক্রিকে একইরকম বলে এই সব প্রান্তিক নারীদের স্তোকবাক্য দিয়ে আসেন, দায়িত্বহীন মন্তব্যের বাইরে কোনও দীর্ঘকালীন সমাধানে তো তাঁদের কোনও আগ্রহ দেখি না।

বারবনিতাবৃত্তির রক্ষকরা এই ধারণাটা প্রচারে অনেকটাই সক্ষম যে পৃথিবী জুড়ে এই পেশা চিরকালই ছিল, আছে এবং থাকবে। সুতরাং একে অনিবার্য বলে গ্রহণ করে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। তাঁরা ভুল করছেন। কালো আর উপনিবেশের মানুষদের নিয়ে শ্বেতাঙ্গদের জমজমাট দাস ব্যবসাও এক সময় অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য আর চিরন্তন বলে মনে হত। ইতিহাস বলছে তা ভুল। বারবনিতাবৃত্তির অবশ্যম্ভাবিতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়—যদি সেই রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে।

বাজারের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও যদি নাবালিকা আনা বন্ধ করা যায় বা খদ্দেরদের বাধ্য করা হয় কন্ডোম ব্যবহারে—যা সম্ভব হয়েছে সংগঠনের জোরে—প্রশাসনিক বা আইনি তৎপরতায় নয়, তা হলে এই পেশার ভেতরের এবং বাইরের নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের দাবি কি হবে? এই পেশার অনিবার্য অমানবিকতাকে স্বীকার করে নিয়ে মধ্যবর্তী সময়ের জন্য বারবনিতাদের উপর পুলিশ-প্রশাসন-সমাজের হয়রানি বন্ধ করার পথ খোঁজা নয় কি? বারবনিতাকে অপরাধী মনে না করে তার সমস্যা মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা এক দিনে শুরু হবার নয়। প্রশ্ন হল সেই প্রক্রিয়ার অনিষ্ঠ অংশীদারিতে আমাদের আগ্রহ আছে কি না। বারবনিতাবৃত্তিতে নিযুক্ত মেয়েদের সমস্যা সমাজের 'অপর' অংশের সমস্যা নয়, মেয়েদের সম্বন্ধে মূল্যবোধের সমস্যারই একটা অংশ। সেজন্য প্রয়োজন বারবনিতাসহ সমস্ত নারী ও মানবাধিকার সংগঠনগুলির একসঙ্গে হাঁটা। মন খুলে কথা বলা।

মন খুলে কথা না বললে খারাপ-মেয়ে ভাল-মেয়ের দেওয়ালটা কখনও ভাঙবে না। যেমন সোনাগাছি প্রকল্পের ডাক্তাররাই যদি 'কেউ আমাদের এই পেশার মেয়ে বলে মনে করে তা হলে ভয়ানক অসম্মান হবে' এই আতঙ্ক থেকে 'পেশাগত ও সামাজিক সম্মান রক্ষার জন্য' (আনন্দবাজার পত্রিকা, সম্পাদক সমীপেষু, ১৮-০৫-০১) নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে সচেষ্ট হন—অন্যদের মূল্যবোধ তাঁরা আর ভাঙবেন কী করে? মুক্তচিন্তা। এই মুহূর্তেই শুরু হোক।

**এই লেখাটির কিছুটা অংশ ৮-১০-২০০১ তারিখে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল**

উ মা

# মনোচিকিৎসায় শিল্পকলা

গত ১০ জুলাই ২০১০ মহাবোধি সোসাইটি প্রেক্ষাগৃহে অমল সোম স্মারক আলোচনার আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তা 'মানস'। পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে স্লাইড সহযোগে 'মনোচিকিৎসায় শিল্পকলা'র ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনা মূলত গান নাচ ও আঁকা মানসিক চিকিৎসায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করেন।

# আত্মবিস্মৃত বাঙালি ও গণপতি চক্রবর্তী

সমীরকুমার ঘোষ

গত সংখ্যার পর

অনেক মেলাতে এখনও 'কথা-বলা পুতুল'-এর খেলা দেখানো হয়। একজন লোক কোলে একটা পুতুল নিয়ে বসেন। তিনি প্রশ্ন করেন, পুতুল উত্তর দেয়। অনেক সময় দর্শকরাও প্রশ্ন করেন। আসল ঘটনা হল পুতুল উত্তর দেয় না, উত্তর দেয় মানুষটাই। পুতুলটার পিঠে থাকে গর্ত। সেখান দিয়ে হাত গলিয়ে পুতুলের মুখ ও ঘাড় নাড়ানো হয়। ইংরেজিতে 'ভেন্ট্রিলোকুইজম' বলে একটা কথা আছে। বাংলায় বলে 'মায়াস্বর'। আভিধানিক অর্থ 'কথা বলার যে ভঙ্গির দ্বারা অন্য কোথা থেকে বা অন্য কারো দ্বারা ধ্বনি উৎপন্ন হচ্ছে বলে শ্রোতাদের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়, তাকেই বলে মায়াস্বর।' যিনি খেলা দেখান, অর্থাৎ 'ভেন্ট্রিলোকুইস্ট' ঠোঁট না নাড়িয়ে, দাঁত চেপে কথা বলেন, মনে হয় পুতুলটাই কথা বলছে। এ নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের একটা গল্পও আছে। ভেন্ট্রিলোকুইজম নিয়ে এই বাগাড়ম্বরের কারণও জাদুসম্রাট গণপতি চক্রবর্তী। এই ক্ষেত্রেও অসাধারণ প্রতিভার নমুনা রেখে গেছেন তিনি। জাদুর সঙ্গে ভেন্ট্রিলোকুইজমের মিশেলে তাঁর খেলা কখনও হয়ে উঠত কৌতুককর, কখনও রোমহর্ষক।

গণপতির একটা পোষা ভূত ছিল, তার নাম 'আত্মারাম'। আত্মারামকে তিনি সংক্ষেপে রাম বা রামু বলে ডাকতেন। ভূতেরা রাম নাম শুনলেই দৌড় দেয়, অথচ গণপতি রাম নামেই জাদুভূতকে ডাকতেন। 'রাম আমার কৌটোর ভেতর চলে এসো'—জাদুকর এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নাকি সুরে উত্তর আসত—'আঁজ্ঞে, দাঁদাঁ, কৌটোর ভেঁতর আচি।' জাদুকর দেব মল্লিক রামকে নিয়ে এক কৌতুককর ঘটনার কথা জানিয়েছেন—একবার স্টেজে উঠে নীল আলোর সামনে দাঁড়িয়ে গণপতি তাঁর পোষা ভূতকে ডাকতে লাগলেন—'আত্মারাম, আমার গেলাসের ভেতর চলে এসো।' ভূত সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—'এঁসেছি হুজুর, কী বঁলব বঁলুন।' এরপর গণপতি বললেন, 'তুমি কোথা থেকে আসছো বলো।' ব্যস, ভূত আর সাড়া দিচ্ছে না। এবার আরও রেগে জাদুকর বললেন,—'তুমি কোথা থেকে আসছ?' ভূত একেবারে নিশ্চুপ। কারণ অবশ্য পরে জানা গেল যে, শুকনো গলায় কথা বলতে বলতে ভূতের হঠাৎ হেঁচকির টান আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। তাই আর সে কথা বলতে পারেনি!

এ গেল কৌতুককর ঘটনা। জগৎবন্ধু মুখোপাধ্যায়ের বাবার বন্ধু ছিলেন গণপতি। বাবার কাছ থেকে শোনা একটা সরস ঘটনার কথা তিনি জানিয়েছেন। ঘটনাটি এরকম—

১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাস। খুলনা জেলার বর্ধিষ্ণু গ্রাম গোপীনাথপুর। সেই গ্রামে পড়েছে গণপতি চক্রবর্তীর ম্যাজিকের তাঁবু। তাঁর সম্পর্কে একটা কথা তখন ছড়িয়ে পড়েছিল যে তাঁর 'রামু' নামে একটা পোষা ভূত আছে, আর সেই ভূতের সাহায্যেই তিনি অনেক অঘটন ঘটান। এই কথা কয়েকদিনের মধ্যে গ্রামের ডাকসাইটে জমিদারবাবুর কানেও উঠল।

একদিন গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক মানুষের সঙ্গে জমিদারবাবুও গণপতিবাবুর কাছে হাজির হয়ে তাঁকে অনুরোধ জানালেন, 'রামুর' ক্রিয়াকাণ্ড দেখতে চান। প্রথমে তিনি রাজি না হলেও সকলের অনুরোধ ঠেলতে না পেরে রাজি হলেন। ঠিক হল যেদিন দল গোপীনাথপুর থেকে পাততাড়ি গুটোবে, সেদিন রাতে উনি রামুর ক্রিয়াকাণ্ড দেখাবেন। সবাই খুশি।

দেখতে দেখতে এসে গেল সেই দিনটি। জমিদারবাড়ির লাঠিয়ালদের থাকার ঘর। সেটা একটা বিরাট আটচালা ঘর। সেখানে সন্ধ্যে থেকেই ঘরের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশজন হাজির রাত আটটার পর জমিদারবাবুর সঙ্গে গণপতিবাবু এলেন। আরো এলেন গ্রামের গণ্যমান্য কয়েকজন আর তাঁদের সঙ্গে কিছু সাহসী যুবক।

গণপতিবাবু বসলেন ফরাসের ওপর, তাঁর পাশে জমিদারমশাই একটু দূরে কবিরাজমশাই এবং তাঁর সামনে অন্যেরা বসলেন।

গণপতিবাবুর কথামত একটি মোটা কাঠের পিঁড়ি রাখা হয়েছে, যেখানে এসে বসবে তাঁর পোষা ভূত 'রামু'।

ঘরে জ্বলছিল একটা হ্যাজাক লণ্ঠন। গণপতিবাবুর কথামতন সেটাকে ঢেকে দেওয়া হলো। ঘর এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। লোকের কথা শোনা যাচ্ছে কিন্তু কারো মুখ দেখা যাচ্ছে না। গণপতিবাবু সকলকে বললেন, 'আপনারা চুপ করে বসে থাকবেন' তারপর তিনি খুব জোরে রামুকে ডাকলেন।

বহুদূর থেকে আওয়াজ এলো—'আসছি।'

আবার তিনি বললেন—'তুমি কোথায়?'

উত্তর এলো—'এই তো এসে গেছি।'

তারপর মনে হলো কে যেন সেই আটচালার খড়ের চালের ওপর এসে বসলো।

আর তারপরেই সেই কণ্ঠস্বর—'দেবো ঘাড় মটকে! দেশলাই পকেট থেকে বের করছিস! ভেবেছিস আমাকে ফাঁকি দিবি!' কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সকলের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। একটা অশরীরী কিছুর উপস্থিতি সকলে অনুভব করছে। এরপর একটা ধুপ করে শব্দ, মনে হল ঘরের আড়াল থেকে কেউ যেন ঘরের মেঝেতে লাফিয়ে পড়ল। আবার সেই কণ্ঠস্বর—'কবিরাজ মশাইয়ের অপমান!' কথা শেষ না হতেই মটাস্ করে একটা আওয়াজ। কাঠের পিঁড়িটা দু-টুকরো করে একটা খণ্ড ঠিক কবিরাজ মশায়ের সামনে পড়লো,—'নিন বসুন'—আবার সেই কণ্ঠস্বর।

অন্ধকার ঘরে সকলে যেন তখন রামুর গায়ের গন্ধ পাচ্ছে। সে এক অদ্ভুত পরিবেশ। একটা গা ছম্‌ছম্ ভাব। কারো মুখে কথা নেই। সকলের অবস্থা তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

গণপতিবাবু বললেন—'আপনারা যদি রামুকে কিছু প্রশ্ন করতে চান করুন। কিন্তু প্রশ্ন করা দূরে থাক, তখন ভয়ে কেউ কথা বলতে পারছে না। তবু তার মধ্যে 'ফটিক চাঁদ' যার হেঁকো ডেকো বলে নাম আছে সে বললে—'বাবু আপনার রামুকে বলুন ভূতি পিসির গাছের একটা পাকা বেল পেড়ে আনতে।'

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল সেই কণ্ঠস্বর—'আচ্ছা আনছি।'

যেমন কথা, তেমন কাজ, কিছুক্ষণ-এর মধ্যে ধুপ করে একটা আওয়াজ, আর সকলের নাকে এলো পাকা বেলের গন্ধ। আরও অবাক কাণ্ড, এতো লোকের মধ্যে সেই অন্ধকারে বেলটা পড়েছে ঠিক ফটিকচাঁদের সামনে।

আবার সোনা গেল রামুর কণ্ঠ—'নাও ফটিকচাঁদ, বেলটা খেয়ে ফেলো আর দেখো ওটা ভূতি পিসির গাছের বেল কিনা!'

ঘরের মধ্যে তখন শ্মশানের নিস্তব্ধতা কেবল শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে শোনা যাচ্ছে। ফটিকচাঁদ কোন রকমে বলল—'গন্ধটা ভূতি পিসির গাছের বেলের মতন। আমি বেলটা পরে খাবো এখন আমার পেট ভরা।'

গণপতিবাবু জমিদার মশায়ের উদ্দেশ্যে বললেন—'আপনি রামুকে কিছু বলুন!'

জমিদার মশায় কোনরকমে গণপতিবাবুকে বললেন—'আপনার রামুকে এখন যেতে বলুন।'

জমিদারবাবুর কথা শুনে রামুর সে কি বিচিত্র হাসি! গণপতিবাবু রামুকে বললেন—'রামু তুমি এখন যেতে পারো।'

আবার শোনা গেল রামুর কণ্ঠ—'নমস্কার জমিদার মশায়, নমস্কার কবিরাজ মশায়।'

তারপর মনে হল কে যেন আড়ায় উঠে বসল এবং একটু পরে দূর থেকে ভেসে এলো সেই আওয়াজ—'আমি চললাম।'

এইবার শুরু হল ফিস্ ফিসানি। মরা মানুষগুলোর মধ্যে যেন প্রাণ সঞ্চার হল। জমিদার মশায়ের নির্দেশে আলোর ঢাকা খোলা হল দেখা গেল, ফটিকচাঁদের সামনে পড়ে রয়েছে ভূতি পিসির সেই ফুটবল সাইজের বেল আর দু-টুকরো করা সেই মোটা কাঠের পিঁড়ি, যার একটাতে বসে আছেন কবিরাজ মশায়।

কবিরাজ মশায় অবাক চোখে গণপতিবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'সত্যি কি রামু বলে কোন ভূতকে ডেকে এনেছিলেন না এটাও আপনার ম্যাজিক?'

গণপতিবাবুর মুখে তখন এক অলৌকিক হাসি, বললেন—'আপনার বুদ্ধিতে কি বলে?'

যাঁরা পুতুল নিয়ে ভেন্ট্রিলোকুইজমের খেলা দেখান, তাঁদের চেয়ে গণপতির খেলা ছিল অনেক উন্নত ধরনের, কঠিনও। প্রথমত তাঁর আত্মারাম কোনো পুতুল ছিল না। তাই গণপতিকে একাই সবটা করতে হয়। পুতুল পাশে নিয়ে বসলে গলার স্বরের তারতম্য করতে হয় না। গণপতিকে স্বরের তারতম্যে বুঝিয়ে দিতে হত রামু অনেক দূর থেকে সাড়া দিচ্ছে, সে ক্রমশ কাছে আসছে, শেষমেশ একেবারে পাশে। যাওয়ার সময়েও তাই। কণ্ঠস্বরের তারতম্য ঘটিয়ে লোককে বোকা বানানো যে কতটা কঠিন কাজ, কত সাধনা লাগে, তা যাঁরা এই শিল্প চর্চা করেন তাঁরাই বোঝেন। গণপতির এক অনুজ জাদুকর 'রয় দ্য মিস্টিক' খুব ভাল ভেন্ট্রিলোকুইজম জানতেন। একবার তো মুঙ্গেরে নিরিবিলিতে একটা গাছের তলায় স্বর প্রক্ষেপণ অভ্যাস করতে গিয়ে বিপদেও পড়েছিলেন। তাঁকে গ্রামবাসীরা গাছের উঁচু ডালে বসা অদৃশ্য কারও সঙ্গে কথা বলতে দেখে ভূতসিদ্ধ ভেবে নিয়ে সাপের কামড়ে মৃত এক যুবককে নিয়ে এসেছিল প্রাণে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য। বুদ্ধির জোরে সেবার বেঁচে গিয়েছিলেন।

বোসের সার্কাস ছেড়ে দিয়ে নানা জায়গায় তাঁবু ফেলে খেলা দেখাতে থাকেন গণপতি। যেখানে যান সেখানেই গণপতির জয়জয়কার। তাঁবুতে দর্শকে দর্শকারণ্য। অজিতকৃষ্ণ বসুর কথায়—গণপতির জাদু প্রদর্শনীর ছিল দুটি দিক। একটি লৌকিক আমোদপ্রমোদের, অন্যটি অলৌকিক রহস্যের। কতকগুলো খেলা

দেখে দর্শকেরা বিস্মিত হয়ে তারিফ করতেন তাঁর সুদক্ষ হস্তকৌশলের এবং ধাপ্পা চাতুর্যের; কিন্তু তাঁর বড় খেলা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গণপতির অলৌকিক শক্তিতে নিঃসন্দেহে বিশ্বাসী হতেন।

বাঙ্গালীর সার্কাস-এর লেখক অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসু লিখেছেন—তাঁহার অলৌকিক জাদুবিদ্যায় সকলেই মোহিত হইয়া যাইতেন। থার্স্টন, কার্টার প্রভৃতি বিখ্যাত য়ুরোপীয় ঐন্দ্রজালিকগণ কলিকাতায় আসিয়া আশ্চর্য খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন সত্য; কিন্তু সে সবই রঙ্গমঞ্চের উপর দর্শকশ্রেণী হইতে দূরে প্রদর্শিত হইত এবং যাদুকরের তিন দিক দর্শকশূন্য থাকিত---তাহাতে 'এসিস্টান্ট' বা সহকারিগণের সাহায্য লাভ করা বা অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্য গ্রহণ করার সুবিধা হইত। কিন্তু গণপতি যাহা যাহা দেখাইতেন, তাহা আলোকিত ও উন্মুক্ত ক্রীড়াকে বা 'রিংএর' মধ্যে চতুর্দিকে নিকটে দর্শকশ্রেণী থাকিতেন। গণপতির পরেও 'বোসের সার্কাসে' এবং অন্যত্র অনেকে তাঁহার কতকগুলি খেলা দেখাইয়াছেন। কিন্তু মনে হয় যে, গণপতির খেলার অসামান্যত্ব এই যে, তিনি যাহা কিছু করিতেন, তাহা একেবারে চক্ষুর নিমিষে সাধিত হইত।

গুণধর গুণপতি

১৯০৯ খৃস্টাব্দে বহরমপুর শহরে বঙ্গদেশের লেফটেন্যান্ট গবর্ণর সার এডওয়ার্ড বেকার যখন গণপতির 'ভৌতিক বাক্সের' খেলা দেখিতেছিলেন, তখন প্রফেসর বসু তাঁহাকে সাদরে আমন্ত্রণ করিয়া 'বাক্সের' অতি নিকটে আসন দান করিয়া বসিতে বলেন; তিনি তথায় বসিয়া একমনে খেলা দেখিতে দেখিতে—গণপতি অদৃশ্য হইবার অব্যবহিত পূর্বে মুহূর্তেই যেন খেলার রহস্যোদ্ভেদে সমর্থ হইয়াছেন, এইভাবে উত্তেজনার মাথায় হঠাৎ ছুটিয়া বাক্সটি ধরিয়া ফেলেন। বাক্সের নূতন রং তখনও শুকায় নাই—ছোটলাটের হাতে রং লাগিয়া যায়। ততক্ষণে গণপতি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। এই খেলা দেখিয়া তিনি ইহার কয়েকদিন পরেই লিখিয়া পাঠাইয়াছেন;—

> Government House, Darjeeling
> The 26th October, 1909
> I have had the pleasure of being entertained recently with performances from Professor Bose's Grand circus. The illusions exibited by Mr. Ganapati were exceptionally good and interesting, and the whole entertainment one of considerable merit.
>
> (Sd.) Sir, Edward Baker
> Lieutenant Governer of Bengal.

২৮ জুলাই, তৎকালীন নামী দৈনিক সংবাদপত্র 'যুগান্তর'-এ 'সেই গণপতি এখন ভিন্ন পথের পথিক' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সঙ্গে বৃদ্ধ 'গণপতি'র ছবিও। লেখা হয় সব ছেড়েছুড়ে জাদুকরের আধ্যাত্মিক জীবনের কথা। খবর প্রকাশ হতেই শোরগোল পড়ে যায়। সাংবাদিকের সাধারণত সর্বজ্ঞ হন। জাদুকর গণপতি চক্রবর্তীর যে ১৯৩৯ সালে মৃত্যু হয়েছিল সম্ভবত সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকের জানা ছিল না। প্রচলিত বয়ানে বলতে গেলে, ততদিনে গণপতি মরে ভূত হয়ে গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে তখনও গণপতি চক্রবর্তীর দু-চারজন শিষ্য ও গুণগ্রাহী জীবিত। ফলে প্রতিবাদ যাওয়ায় 'এবার দ্বিতীয় কিস্তির গণপতি-কাহিনী' শিরোনামে ৭ আগস্ট ১৯৭৫ একটি ভ্রম-সংশোধন ছাপতে হয়।

গণপতি বলে যাঁকে নিয়ে প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছিল তাঁর নাম ছিল গুণপতি। গুণপতির সঙ্গে ঘটনাক্রমে জাদুকর গণপতির ভাল মতন পরিচয় ছিল। প্রসঙ্গত গুণধর গুণপতির সঙ্গে গণপতির পরিচয়ের সূত্রটা জানানো যেতে পারে। গণপতি একবার লালগোলার রাজার বাড়িতে ম্যাজিক দেখাতে যান। সেখানে রাজার কর্মচারী রণজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। রণজিৎ রীতিমতো শিক্ষিত ছিল। লেখাপড়ায় পিছিয়ে-থাকা গণপতির তাকে পছন্দ হয়ে যায়। রণজিৎ ঢুকে পড়ে গণপতির দলে। প্রথমে বুকিং ম্যানেজার, তারপর স্টেজ ম্যানেজার। আরও পরে অ্যাসিস্টান্ট জেনারেল ম্যানেজার। করিৎকর্মা রণজিৎ কাজকর্মের ফাঁকে গণপতির জাদুর খেলার কৌশলগুলো শিখে নেয়। তার পর নিজস্ব দল তৈরি করে। টাকা ঢালবার একজন লোকও পেয়ে যায়। রণজিৎ গণপতির সব খেলাই দেখাতে থাকে। ইতিমধ্যে সে রণজিৎ রায় থেকে নিজেকে 'গুণপতি রায়' করে ফেলেছে। যদিও 'গুণধর রায়' করলে সর্বাঙ্গসুন্দর হত! গণপতি তাঁর চক্রবর্তী পদবি প্রায় ব্যবহার করতেনই না। সর্বত্রই তিনি 'জাদুকর গণপতি' নামে পরিচিত ছিলেন। গুণধর গণপতিও তার 'রায়' উহ্য রাখত। সাধারণ লোকে গণপতি ও গুণপতি নাম দুটোকে গুলিয়ে ফেলত। গণপতির নাম ভাঙিয়ে দেখতে দেখতে জাদুকর গুণপতির পসারও বাড়তে থাকে। তবে বলা বাহুল্য, যারা গুণপতির খেলা একবার দেখত তারা দ্বিতীয়বার তার ছায়া মাড়াত না।

বাংলার আরেক যাদুরত্ন ছিলেন যতীন্দ্রনাথ রায়। যাঁকে 'রয় দ্য মিস্টিক' নামে দেশ-বিদেশের লোক চিনত। সব পেশাদার ক্ষেত্রেই যেমন হয়-একই ক্ষেত্রের দুজন একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না। আড়ালে কুৎসা ছড়ায়, ছোট করার চেষ্টা করে। সেদিক থেকে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন মহান ব্যতিক্রম। গণপতি সম্পর্কে তাঁর ছিল অশেষ শ্রদ্ধা। ছোটবেলা থেকে গণপতির বিখ্যাত ভৌতিক বাক্স ও ভৌতিক বৃক্ষের রোমাঞ্চকর কাহিনী

শুনে তাঁকে দেখার প্রবল উৎসাহ তৈরি হয় তাঁর মনে। ১৯১১ সালে জলপাইগুড়িতে চাকরি করতে গিয়ে জানতে পারেন জাদুকর গণপতি সদলবল এসে জলপাইগুড়ি মাতিয়ে দিয়ে গেছেন। দেখেন, ছোট-বড় সবাই তাঁর প্রশংসায় মুখর। এমনকি কেউ কেউ তাঁকে অনুসরণ করে ক্ষুদে গণপতি হবার চেষ্টাও করছে। তাদেরই কয়েক জন মিলে একটা দল করে যতীন্দ্রনাথকে তাতে ভিড়িয়ে নেয়। জাদুকর হবার প্রলোভনে পড়ে সরকারি চাকরিটিও ছেড়ে দেন তিনি। যাই হোক, সেই থেকে কোথায় গেলে গণপতির দর্শন মিলবে আর তাঁর বিস্ময়কর খেলাগুলো দেখা যাবে এটাই হয়ে ওঠে তাঁর একমাত্র চিন্তা। এরই মাঝে একবার কলকাতায় এসে শোনেন গণপতি গড়ের মাঠে খেলা দেখাচ্ছেন। আসলে যে ছিল গুণপতি। যতীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'গণপতি মনে করে অগ্রিম টিকিট কিনে সেই খেলা দেখতে গিয়ে অতি নিরাশ ও বিতৃষ্ণ হয়ে ফিরে আসতে হল আমাকে। গণপতির চেহারা এবং খেলার যে সব বর্ণনা শুনেছিলাম তার কিছুর সঙ্গেই কোনো মিল নাই এর। যেমন বাজে সেই যাদুকর, তেমনই অতি বাজে তার খেলা। 'গণপতি' স্থলে 'গুণপতি' নামেতে এই কারসাজিটুকু করে লোককে ধোঁকা দিয়ে টাকা লুটছে সে। আমার মতো অনেকেই এই ধাপ্পাবাজি বুঝতে না পেরে তার শিকার বনে গিয়েছিল।' এই হল গুণধর গুণপতির কাণ্ড।

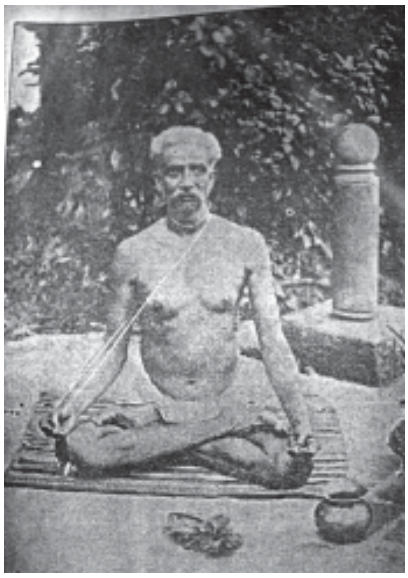

বৃদ্ধ গণপতি

যতীন্দ্রনাথের 'যাদুকর গণপতি প্রসঙ্গে' শীর্ষক একটি লেখা থেকে মানুষ গণপতি কেমন ছিলেন তারও চিত্রটা পাই। যতীন্দ্রনাথ লিখছেন, ' গণপতিকে সর্বপ্রথম দেখি ময়মনসিং সহরে প্রথম যুদ্ধের সময়। সহরের কেন্দ্রস্থলে এক বিরাট তাঁবুতে মহাসমারোহে খুলেছেন ভূতের রাজা যাদুকর গণপতি তাঁর যাদু প্রদর্শনী। সহরের লোক ভেঙ্গে পড়েছে তাঁর সেই অদ্ভুত খেলা দেখতে। গ্রাম গ্রামান্তর থেকে আসছে দলে দলে মানুষ তাঁর নাম শুনে। একবার তাঁর খেলা দেখে তাদের আশ মেটে না। দিনের পর দিন হোটেলের ভাত খেয়ে খেলা দেখে তারা, আর গ্রামে গিয়ে পাঠিয়ে দেয় তাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয়স্বজনদের। সেই সঙ্গে মুখে মুখে প্রচার করে দেয় 'এমন তাজ্জব কাণ্ড কারখানা এই মুল্লুকে কেহ কখনো দেখে নাই।' শুভ মুহূর্তে এক বন্ধুর সহায়তায় প্রদর্শনীর বুকিং অফিসে গণপতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হল। লম্বা সুঠাম দেহ গৌরবর্ণ সুশ্রী প্রৌঢ় বয়স্ক বসে আছেন ডিনার সুট পরে একটা চেয়ারে। তাঁর কালো কোটের দুপাশে আকাশের তারার মতো জ্বলজ্বল করছে অসংখ্য সোনার পদক—দেখলে চোখ ঝলসে যায়। পরিচয় হওয়ামাত্র টেনে নিলেন তিনি আমাকে তাঁর পাশে, চুম্বক যেমন করে লোহাকে টেনে নেয়। মুহূর্তের পরিচয়ে হয়ে গেলাম আমরা যেন কালের বন্ধু। এতো সহজে কী করে যে মানুষ মানুষকে আপনার করে নিতে পারে এ কথা ভাবলে এখনও অবাক লাগে। তাঁর প্রাণখোলা কথাবার্তা ও বন্ধুসুলভ ব্যবহার আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। যে কদিন ময়মনসিংহে ছিলাম রাত্রে তাঁর প্রদর্শনীতে যাওয়া আর সকাল বেলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর বাড়িতে আড্ডা দেওয়া, এই ছিল আমার কাজ। তিনিও কয়েকবার এসেছেন আমার বাসায় আমার অসুখের খবর পেয়ে। এতে তাঁর সহৃদয়তাই প্রকাশ পেয়েছে।

নানা গুণে ভূষিত ছিল গণপতির চরিত্র। যাদু ছাড়া তিনি ছিলেন অভিনয়, গানবাজনা, নানা প্রকার হাস্যকৌতুক ও রসিকতায় সিদ্ধহস্ত। আসর জমাতে তিনি ছিলেন অসম্ভব পটু। সদর রাস্তার উপর একটা বড় বাড়িতে তিনি বাসা নিয়েছিলেন। রাস্তার ধারে একটা ঘরে ছিল তাঁর দপ্তর ও আড্ডাখানা দুই-ই। যাঁরাই আসতেন সকলকেই দরাজ হাতে চা-মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়—তার পর চলত ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা রকমের গল্পগুজব—দেশ বিদেশের তাঁর মজার মজার অভিজ্ঞতার কাহিনী। গল্প বলতে বলতে এমন সব চোখ মুখের ভঙ্গি করতেন যে তা দেখে হাসতে হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরে যেত। তিনি একলাই বৈঠক মাত করে রাখতেন। অবশ্য তার ফাঁকে ফাঁকে বৈষয়িক কাজ কর্মও চলত। আড্ডায় যখন তিনি বসতেন, তখন আর তাঁকে যাদুকর গণপতি বলে চেনা যেত না। পরনে থাকত একাট পট্ট-বস্ত্র, গায়ে সিল্কের চাদর আর যতদূর মনে পড়ে টিকিতে একটা ফুলও যেন ঝোলান থাকত। দেখে তখন তাঁকে একজন নিষ্ঠাবান পুরোহিত ব্রাহ্মণ বলেই মনে হত। গৌরকান্ত সুশ্রী চেহারায় তাঁকে মানাতো বেশ ঐ সাজে।'

সংবাদপত্র অফিসে নিয়মিত যাতায়াত করে, সাংবাদিকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে, কখনও কলাটা-মুলোটা দিয়ে গালগপ্পো ছাপিয়ে নেওয়ার যে শিল্প পরবর্তীকালে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তা গণপতির জানা ছিল না। তাঁর প্রচারমাধ্যম ছিল মানুষ। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত তাঁর আশ্চর্য কাণ্ডকারখানার কথা। যতীন্দ্রনাথ

গণপতির এক অভিনব প্রচার কৌশলের কথাও জানিয়েছেন। 'তাঁর বিরাট দলের লোকজনের জন্যে যত ভাত রান্না হত, উঠোনের মাঝখানে একটা তুলসী গাছ পুঁতে তার চারধারটা গোবর দিয়ে লেপ্টে ও তাতে অনেক স্থান জুড়ে কলার পাতা সাজিয়ে স্তূপাকারে সেই ভাত ঢেলে রাখা হত। রাস্তার দিকে দরজাটা এমনভাবে ফাঁক করে দেওয়া হত যে রাস্তার লোক যেন সেই ভাতের স্তূপ দেখতে পায়। কৌশলে জানিয়ে দেওয়া হত সবাইকে যে গণপতির পোষা ভূতগুলোর জন্যেই এই পরিমাণ ভাত উৎসর্গ করা হয়ে থাকে প্রতিদিন। অজ্ঞলোক তা বিশ্বাস তো করতোই এবং আরও রং চড়িয়ে দিয়ে চারিদিকে নানা কথা প্রচার করত। এতে ফলও হত ভাল।'

১১ নভেম্বর ১৯৩২, স্বাস্থ্যমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দিরে জাদুর খেলা দেখান গণপতি। তার প্রচারপত্রে লেখা হয়েছিল—'প্রত্যহ থিয়েটার বায়স্কোপ প্রভৃতি দেখিতে পাইবেন কিন্তু যাদুকর গণপতির ম্যাজিক দেখার ও মা-লক্ষ্মীগণকে দেখাইবার এরূপ সুবর্ণ সুযোগ সত্যিই সুদূর পরাহত। কারণ গণপতিবাবু বৃদ্ধ হইয়াছেন ও বরানগর কাশী দত্তের রোডে ঁশ্রীশ্রী নীরদবরণ জীউর মন্দির স্থাপন করিয়া ভগবৎ প্রেমে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, বহু আয়াসে ও বহু অনুরোধে মাত্র এই রাত্রির জন্য তিনি তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ম্যাজিকগুলি শেষবারের জন্য দেখাইয়া অবসর গ্রহণ করিবেন। আসুন, মাতা কন্যার সহিত স্ত্রী ভগ্নীর সহিত পুত্র পিতার সহিত একসঙ্গে পুণ্যকার্যে দান ও চিত্তপ্রীতির এরূপ সুযোগ ধারণাতীত আশাতীত।'

গণপতি ১৯৩৯ সালে যখন মারা যান, তখন তাঁর বয়স ৮১। অর্থাৎ গণপতি শেষবার যখন খেলা দেখান তখন তাঁর বয়স ৭৪। সেই প্রচার পত্র থেকে গণপতি কী কী খেলা দেখাতেন তারও কিছু নমুনা পাওয়া যায়। তাতে ছিল—প্রিজন্ এক্ট-অর্থাৎ বাসুদেবের কারামুক্তি। ইলিউশন ট্রী বা ভৌতিক বৃক্ষ, ইলিউশন বক্স বা ভৌতিক বাক্স (জগৎবিখ্যাত)। মিস্ হিঙ্গনবালার অদ্ভুত আবির্ভাব! ওবিডিয়েন্ট বল বা আজ্ঞাকারী গোলার খেলা ইজিপ্সিয়ান ব্ল্যাক আর্ট বা ভৌতিক জাদুর গৃহ। ক) ভূতের আবির্ভাব, খ) মড়ার মাথা চুরুট খাইবে, গ) টেবিল শূন্যে উড়িবে, ঘ) পাওয়ার তাস, ঙ) সর্ব্বসমক্ষ হইতেই গণপতির অন্তর্ধান ইত্যাদি। প্রচারপত্রে এও লেখা ছিল—সেই বিশ্ব-বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান যাদুকর গণপতি—যাহার অত্যাশ্চর্য ম্যাজিক অবলোকনে স্বয়ং সম্রাট পর্যন্ত মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া যাঁহাকে—দ্য গ্রেট উইজার্ড অফ দি ইস্ট উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

শেষ জীবনে সব ছেড়ে দিয়ে গণপতি সাধনভজনে মেতে ছিলেন। বিষয় আশয়ে কোনো আসক্তি ছিল না। বৃদ্ধ বয়সে ১১ নং আহিরীটোলায় একটি বাড়ি কেনেন। সেখানে থাকতে থাকতেই ১২১ ও ১২১/১ কাশীনাথ দত্ত রোডে (একটি উদ্যান কিনে সেখানে) বাড়ি করেন ১৯৩২-৩৩ সালে। উত্তর-পশ্চিমে একটা বাগানবাড়িও ছিল। বাড়িতে তিনখানি মন্দির স্থাপন করেন। যার মাঝখানে ছিল নীরদবরণ, ডাইনে মহাদেব ও বামে দুর্গামাতা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে বোসের সার্কাস ছেড়ে বেরিয়ে আসার সময় থেকেই গণপতির সঙ্গী হন হিঙ্গনবালা ওরফে হরিমতী দাসী। হরিমতীর সঙ্গে গণপতির সম্পর্কটা ঠিক কিরকম ছিল, সে সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু জানা যায় না। হরিমতী যে গণপতিকে ভালবাসতেন, সে কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। না হলে সেকালের সবচেয়ে নামী 'বোসেস সার্কাস' থেকে গণপতির সঙ্গে বেরিয়ে আসতেন না। গণপতি তখন আক্ষরিক অর্থেই চালচুলো হীন। একালের ভাষায় বলতে গেলে ওঁরা সারা জীবন 'লিভ টুগেদার' করেছেন। সেই সময়ের হিসাবে এটা নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসী পদক্ষেপ। ওঁদের একত্র জীবনযাপনকে সমাজ কী চোখে দেখত সে কথাও জানা যায় না। তবে গণপতির শিষ্যরা, মানে জাদুপ্রভাকর দুলাল দত্ত এবং জাদুসূর্য দেবকুমার হরিমতীকে 'গুরুমা'র সম্মানই দিতেন। স্নেহময়ী হরিমতী সম্পর্কে এখনও অপার শ্রদ্ধা পোষণ করেন শতবর্ষ ছুঁতে চলা জাদুকর দুলাল দত্ত। ওঁদের সম্পর্ক নিয়ে কোনো কৌতূহল আদৌ ছিল না তাঁর। বিয়ে না করলেও হরিমতীর প্রতি কর্তব্যকর্মে কোনো ত্রুটি রাখেন নি গণপতি। এক সময় জাদুসূর্য দেবকুমারকে দত্তক নিতে চেয়েছিলেন। দেবকুমারের পিতা-মাতা রাজি হননি। গণপতির পাঁচুবালা নামে একটি পালিত কন্যা ছিল। গণপতি তার বিয়েও দেন। হরিমতী ও পাঁচুবালাকে নিয়ে গণপতি থাকতেন মন্দিরের পেছনে বসতবাড়িতে। সব কিছুই লিখে দিয়েছিলেন হরিমতীর নামে। উইলে লেখেন—কোনো সম্পত্তি বিক্রি করা যাবে না। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনে বাগানবাড়ির দু কাঠা জায়গা বিক্রি করা যেতে পারে। হরিমতীর পর পাঁচুবালা জীবনস্বত্বে বসতবাড়ি ভোগ করতে পারবে। গণপতি ভূপেন রায়চৌধুরি নামে একটি ছেলেকেও প্রতিপালন করেন। ভূপেন জাদুর খেলাও দেখাতেন।

বৃদ্ধ হরিমতী ভূপেন ও তার স্ত্রী বীথিকাকে সেবাইত করেন। এই ভূপেনের বিরুদ্ধে পরে বহু অভিযোগ ওঠে। ঠাকুরবাড়িটুকু বাদ দিয়ে পুরো বাড়িটা গ্রাস করে প্রমোটর। ষাটের দশকে পাঁচুবালা ও ভূপেনের বিরোধের সময় পুলিসের এক হিসাবে জানা গিয়েছিল গণপতির রেখে যাওয়া ৯৬ ভরি সোনা ও ৪৪ কেজি রুপোর কথা। ছিল দুর্গামাতার সোনার মুকুট। গণপতির অজস্র সোনার মেডেল। অথচ হতদরিদ্র অবস্থায় মারা যান হরিমতী, ১৯৯১ সালে। পাঁচুবালা মারা যান ৯৭-তে। ৯০ সালেই জানাজানি হয় তছরুপ ও অপকীর্তির কথা। পাঁচুবালার স্নেহধন্য কানন মাইতি এবং গণপতির বাড়ির কয়েকজন ভাড়াটে ও দোকানদার মিলে দেবোত্তর সম্পত্তি বিক্রির বিরুদ্ধে ১৯৯২ সালে শিয়ালদা আদালতে মামলা করেন। মামলা হাইকোর্ট অবধি গড়ায়। রায়ে

প্রমোটরেরই জিত হয়েছে।

সম্পত্তি ছেড়ে আসা যাক গণপতির কথায়। জাদুর খেলা দেখিয়ে গণপতির পসার কেমন ছিল তার কিছুটা বোঝা গেল। দু হাতে তিনি যেমন টাকা রোজগার করেছেন, তেমনি পরের উপকারে দানও করে গেছেন অকাতরে। অজিতকৃষ্ণ বসু একটা ঘটনার কথা জানিয়েছেন—'এক জায়গায় যাদুর খেলা দেখানো শেষ হয়ে গেছে। গণপতির সঙ্গে দেখা করলেন এক দরিদ্র, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ। গণপতির কাছে তাঁর একটি আর্জি আছে, সে আর্জি মঞ্জুর করতেই হবে। হাওয়া থেকে টাকার পর টাকা ধরার বিদ্যেটা শিখিয়ে দিতে হবে তাঁকে; নিদারুণ অর্থাভাব আর সহ্য হয় না, পারানির কড়ির অভাব মেয়েটার ভাল সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়ে যেতে বসেছে।

অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো যাদুকর গণপতির দুটি চোখ, গরিব ব্রাহ্মণকে বললেন, 'ভাই সত্যি সত্যি হাওয়া থেকে টাকা ধরার বিদ্যে জানলে কি আর এতো লোকজন, লটবহর নিয়ে ঘুরে ঘুরে যাদুর খেলা দেখিয়ে টাকা রোজগার করতে হত আমাকে?'

যুক্তিটা হৃদয়ঙ্গম করে তখন হতাশ হলেন কন্যাদায়গ্রস্ত গরিব ব্রাহ্মণ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে হতাশ হতে হয়নি। সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ করে ব্রাহ্মণের মেয়েটির ভাল বিয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন গণপতি।'

সেই সময় যা রোজগার করেছেন রাজার হালে থাকতে পারতেন। কিন্তু তাঁর জীবনযাপন ছিল অতি সাধামাঠা। সংসারে ছিলেন সন্ন্যাসীর মতো। অত বড় মাপের মানুষ ছিলেন বলেই তাঁর অনুজ জাদুকররা অসম্ভব শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন তাঁর কথা। রয় দ্য মিস্টিক লিখছেন—'যাদুকর হিসাবে তিনিই ছিলেন তখনকার দিনে এদেশে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন অতি সজ্জন। সেই জন্যই দেশে বিদেশে তিনি এতটা সুনাম ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছিলেন। স্বাধীন অর্থকরী বৃত্তি হিসাবে আমোদ-আনন্দের জগতে যাদুবিদ্যারও যে উজ্জ্বল সম্ভাবনা আছে এটা তিনিই নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। এ দেশের এনেকেই তাঁর কাছে প্রেরণা লাভ করে যাদুবিদ্যার চর্চা ও অনুশীলন আরম্ভ করেছেন। পৃথিবীর যাদুবিদ্যার ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী যাদুকর 'রবেয়া উদ্যাঁ'কে (Rubert Houdin) যেমন 'আধুনিক যাদুবিদ্যার জনক' (Father of Modern Magic) বলা হয়; তেমনি যাদুকর গণপতিকেও বলা যেতে পারে 'এদেশে আধুনিক যাদুবিদ্যার পথ প্রদর্শক।'

স্বপ্নলোকের নায়কের প্রস্থানও গল্পকাহিনীর মতো। সেদিন ছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত নীরদবরণ মন্দিরে অন্নকূট উৎসব। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রসাদ নিতে ভিড় করেছে বহু ভক্ত আর দরিদ্র মানুষ। গণপতি বসে আছেন তাঁর নীরদবরণের কাছে। সামনের কাশীনাথ দত্ত রোড দিয়ে প্রায়শই শবদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কাশীপুর শ্মশানে। তখনও শেষ খাটে শুয়ে শ্মশানের পথে চলেছে একজন। বাহকেরা 'রাম নাম সৎ হ্যায়' ধ্বনি দিচ্ছে। সেই ধ্বনি কানে এল অসুস্থ অর্ধশায়িত জাদুসম্রাটের কানে। তিনি বললেন, 'চলেছো বন্ধু! যাও, আমিও তোমার পিছনে যাচ্ছি।' তার পর আরাধ্য দেবতার বিগ্রহকে জড়িয়ে ধরে ধীরে ধীরে ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। দিনটা ছিল বাংলার ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ ইংরেজির ২০ নভেম্বর ১৯৩৯। গণপতির প্রিয় খেলা ছিল 'পলায়ন'। আবার ফিরে আসতেন, এই একবারই আর ফিরে এলেন না!

বাঙালিকে আত্মবিস্মৃত জাতি বলা হয়। গণপতির প্রয়াণ ৭০ বছর পেরিয়ে গেছে। বিস্মরণের পক্ষে এটা পর্যাপ্ত সময়। যে গণপতিকে সে সময় 'জাদুসম্রাট' বলা হত, যাঁর খেলা দেখে মালদহে লর্ড কারমাইকেল, কাশিমবাজারে ছোট লাট বেকার সাহেব প্রশংসাপত্র দান করেন; নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী 'যাদুবিদ্যাবিশারদ' উপাধিতে বিভূষিত করেন; দেশি-বিদেশি রাজারাজড়া মুগ্ধ হয়ে মানপত্র এবং তিনশোরও বেশি স্বর্ণপদক দিয়েছেন; বর্ধমান জেলার বাঁওলের জমিদার হরেকৃষ্ণ দে যাঁকে কুণ্ডায় জমি ও সোনার মেডেল দেন, তাঁর প্রথম স্মরণসভার আয়োজন করতে প্রায় ৩০ বছর লেগে যায়। সেই সময় 'মায়ামঞ্চ' নামে জাদু পত্রিকা প্রকাশিত হত। তারই সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়ের উদ্‌যোগে ১৯৬৮ সালে গণপতির প্রথম স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় মহানগরীর বহু বিশিষ্ট যাদুকর, যাদুকরী, যাদুবিশেষজ্ঞরা যাদুগুরুর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। যার সভাপতিত্ব করেন অজিতকৃষ্ণ বসু। প্রধান অতিথি জাদুসূর্য দেবকুমার। সেখানে জাদুগুরুর স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি তহবিল গঠন ও প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ জাদুশিল্পীকে গণপতি পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্তও হয়। দাবি তোলা হয়—তাঁর বাসস্থান বরাহনগরে তাঁর নামে একাট রাস্তার নামকরণের। বলা বাহুল্য, এগুলোর কোনোটাই হয়ে ওঠে নি। মায়ামঞ্চ পত্রিকাটাই উঠে যায়। তবে পত্রিকার তরফে 'গণপতি স্মৃতি সংকলন' প্রকাশিত হয়। যেখানে তৎকালীন সেরা জাদুকর—যেমন অশোক রায় (ওসাক রে), জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, আশু দে, শৈলেশ্বর, স্বপন ঘোষ প্রমুখের লেখা ছিল।

স্মরণসংখ্যায় জাদুকরেরা গণপতি জাদুকর এবং মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন, তা লিখেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। জাদুকর তথা জাদুবিশেষজ্ঞ আশু দে লিখছেন—'গণপতি যে সকল খেলা দেখাইতেন ঐ জাতীয় খেলা দেখাইয়া তাহার পূর্বে এ দেশে কোনো যাদুকর 'নাম' করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। ইংলন্ড এবং আমেরিকাতেও ঐ ধরনের খেলা 'ধরনের' হুবহু সমান নয়। সে

সময় জনসাধারণের কাছে অভিনব। Davenport Brothers ও বৃদ্ধ Maskelyue-এর নাম এ সম্পর্কে মনে পড়িতেছে। Davenport Brothers একবার এদেশে আসিয়াছিলেন কিন্তু কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। Maskelyne আসেন নাই, এবং অন্য কোন বিদেশী যাদুকর তখনও পর্যন্ত যেরূপ নাম Thurston অর্জন করিয়াছিলেন সেরূপ Sensation ভারতে সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। এদিকে গণপতি সম্বন্ধে যতটুকু জানি। তার ইংরাজী পড়াশুনা ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। বই অথবা খবরের কাগজ পড়িয়া প্রেরণা পাওয়া কল্পনা করিতে পারি না, তবে 'প্রেরণা'-টি আসিল কোথা হইতে? ... আর একটি কথা বলি। এটা কি আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন যে গণপতি তাহার Illusion Box অথবা Illusion Tree যেভাবে অর্থাৎ যে পদ্ধতিতে দেখাইতেন ঠিক ঐ পদ্ধতিতে এদেশে বা বিদেশে কোন যাদুকর ঐ জাতীয় খেলা দেখান নাই এটি শুনিলে অত্যুক্তি মনে হইবে—কিন্তু ঐ Box Trick তিনি যেভাবে Present করিতেন এবং Maskelyne বা Cooke বা তাঁহাদের সমপদস্থ সমসাময়িক ম্যাজিশিয়ানরা যেভাবে দেখাইতেন মনে মনে এই দুইটির তুলনা করিলেই আমার উক্তির যথার্থ অনুভূত হইবে।' আশুবাবু গণপতির বাক্স থেকে বেরিয়ে আসা এবং আবার ঢুকে যাওয়ার প্রসঙ্গটি বর্ণনা করে প্রশ্ন তোলেন—'এই যে মৌলিক সৃষ্টি ইহার ভিত্তি কোথায় ছিল? ... বয়স অনেক হইয়াছে, কিছু কিছু দেখিয়াছি কিছু পড়িয়াছি। কিন্তু Illusion Box এর দ্বিতীয়ার্দ্ধে, যে Tense মুহূর্তে মুক্ত অবস্থায় ঘণ্টা বাজাইয়া তাঁবু প্রদক্ষিণের পরে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ, সঙ্গে সঙ্গে সব পর্দা উত্তোলন এবং গণপতি একেবারে নিশ্চিহ্ন—ইহাতে যে একটি অলৌকিক ও অবর্ণনীয় পরিবেশের সৃষ্টি হইত সেরূপ আর কোথাও দেখি নাই বা পড়ি নাই। এই Psychological masterpiece র প্রেরণা কে গণপতিকে দিয়াছিল?'

১৩৫৭ সালে 'মৌচাক' পত্রিকায় প্রোফেসর আর এন রুদ্র 'প্রাচীন ও আধুনিক বাঙালী যাদুকরদের সংক্ষিপ্ত জীবনী' লেখেন। তাতে 'যাদু সম্রাট গণপতি' অধ্যায়ে উনি লেখেন—'আজকাল দেখা যায় যে অনেকে 'যাদুসম্রাট' উপাধিতে নিজেকে প্রচার করছেন। কিন্তু 'যাদু-সম্রাট' বলতে সত্যিকারের ঐ একজনই ছিলেন। বিলাতের 'যাদুকর মণ্ডলী' থেকে তাঁকে ঐ পদবীতে ভূষিত করা হয়েছিল। তোমরা বোধহয় জান, রাজা হয় একজন—আর সকলে হয় তাঁর প্রজা। কিন্তু এখন শুধু রাজা নয়, 'সম্রাট'ই হয়েছে অনেকে, কাজেই ছোটখাটোদের পদবী নিয়ে হয়েছে মুস্কিল!

যাক এ সম্পর্কে বেশী লিখে কোন লাভ নেই। কারণ, এটা আমি স্থির জানি যে, গণপতিই একমাত্র 'যাদু-সম্রাট' ছিলেন।'

**পরিশিষ্ট**

গণপতি চক্রবর্তীর জীবিত কালে ও তাঁর প্রয়াণের পরও বহু লেখালেখি হয়েছে। ক্রমশ ফিকে হয়ে এসেছে সেই লেখালিখির প্রভাব। এখনকার প্রজন্ম 'ভারতীয় আধুনিক জাদুবিদ্যার জনক' হিসাবে সর্বজনস্বীকৃত গণপতির নামই শোনেনি তো প্রথম ফরাসি দেশের রাজধানীতে জাদু দেখিয়ে আসা প্রথম বাঙালি জাদুকর সত্যচরণ ঘোষ বা প্রথম ইংল্যান্ড মাতিয়ে আসা রাজা বোস, তার পরে রয় দ্য মিস্টিক-দের নাম!

ফিরে আসি একেবারে গোড়ার কথায়। বলা ভাল কিছু না-জানা প্রশ্নে। জাদুসূর্য দেবকুমারের মুখে শুনেছিলাম, গণপতির মৃত্যুতে তাঁর সবচেয়ে নামী শিষ্য 'জাদুসম্রাট' পি সি সরকার আসেন নি। শ্মশানে যাওয়ার সময় বিস্মিত অজিতকৃষ্ণ দেবকুমারকে বলেছিলেন—'সরকার এটা কী করল!'

ব্যস্ততার কারণে জাদুসম্রাট না-ই আসতে পারে গুরুর শেষযাত্রায়! দেশ-বিদেশে খেলা দেখানোর ব্যস্ততায় কিছু লিখে উঠতে নাই-ই পারেন! কিন্তু তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের গণপতিকে গুরু হিসাবে স্বীকার না করা, পক্ষান্তরে ছোট করার প্রবণতার উৎস হয়ত এই লেখকের মতো ভবিষ্যতেও কেউ জানতে আগ্রহী হয়ে উঠতে পারেন। 'ধ্বনিটিকে প্রতিধ্বনি সদ্য ব্যঙ্গ করে' কি না সে কথাও উঠতে পারে। ভারতীয় জাদুকর হিসাবে সারা বিশ্বে অশেষ মান পি সি সরকারের। তাঁর প্রতিভায়, কর্মে প্রশ্ন তোলার অবকাশই নেই। কিন্তু বাঙালী জাদুকর বলতে শুধু তাঁকে এবং তাঁর বংশধরদেরই জানলে বাংলার জাদু-ঐতিহ্যকে অসম্মানই করা হবে। কিছু নথিপত্র ঘেঁটে তাই ছোট মুখে বড় প্রশ্নটা তুলতেই হল।

**পুনঃ** জাদুকর শৈলেশ্বর অকৃপণভাবে লেখার তথ্যাদি জুগিয়েছেন। তাঁর কাছে আমার অশেষ ঋণ।

উমা

WITH THE BEST COMPLIMENTS OF

# M/S SPARSH INTERIORS (P) LTD.

Interior Designers, Planners and
Turnkey Project Executors

221, A.J.C. BOSE ROAD, GROUND FLOOR
KOLKATA - 700 017

Ph. No: 033-2287 0089, 2287 1585

FAX : 033-2287 5971, 2287 1585

Email:- sparshinteriors@live.in

# অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে পারত না অপু

অপূর্ব মুখোপাধ্যায়

(২২.৫.১৯৫৪-৭.৮.২০১০)

'তুমি কি ভেবেছো, আমি মরে যাব, আরে না, না তোমার সঙ্গে আমার অনেক বোঝাপড়া বাকি আছে। সেগুলো শেষ করতে হবে না? হাসপাতালে তোমাকে আসতে হবে না। সুস্থ হয়ে বাড়ি যাই তখন বাড়িতে এসো।'

অপারেশনের দিন হাসপাতাল থেকে আমার সঙ্গে ফোনে এটাই অপুর শেষ কথা। তারপর খবর পেলাম ও সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে। কয়েক দিন বাদে শুনলাম ও ভেলোরে গিয়েছিল। হাসপাতাল থেকে বলেছে সব ঠিকঠাক আছে। ব্যস, আজ যাবো কাল যাবো করে আমার যাওয়ার আগেই, বোঝাপড়াটা বাকি রেখে গত ৭ই আগস্ট ২০১০-এ অপু চলে গেল। ওর এই চলে যাওয়াটা কেমন যেন মনে হচ্ছে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল।

১৯৭৫ সালে দেশে জারি হল জরুরি অবস্থা। তার জেরে শুরু হল ব্যাপক ধড়পাকড়। আপাতভাবে বন্ধ হল সমস্ত মিটিং, মিছিল রাজনৈতিক আলোচনাচক্র। এই সময়ে বালি মিলের শ্রমিক বস্তিতে ওখানকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কুল বারীন, তন্ময় প্রসূনের সঙ্গে। বেলেঘাটা ফুলবাগান অঞ্চল থেকে ওরা তিনজন আসত পড়াতে। বারীন-ই যে অপু তা আমি জেনেছি অনেক পরে।

যাই হোক, সেই সময় থেকে শুরু হয় আমাদের এক সাথে পথ চলা। অন্ধকার শ্রমিক বস্তির মাঝখানের চাতালে (যেটা ছিল এলাকার মদের ঠেক) ধীরে ধীরে গড়ে উঠল সান্ধ্য স্কুল। মিলের শ্রমিক নিমাইদা, কেষ্ট দা ও আরো কয়েকজন শ্রমিক এগিয়ে এলেন স্কুলটা দাঁড় করাতে। সবাই মিলে বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কেটে এনে, লোকের বাড়ি থেকে টালি বয়ে এনে তৈরি হল স্কুল। গলির মোড়ে খড়ের দোকান থেকে লাইন টেনে জ্বালানো হলো আলো। চলতে লাগল স্কুল। প্রতি একদিন অন্তর অপু আসত। ওর অনেক প্রকল্পনা, ভবিষ্যৎ সর্মসূচি নিয়ে চলত আলোচনা। ওর সব কাজের কেন্দ্রবিন্দু ছিল সাধারণ মানুষ, বিপন্ন বিপদগ্রস্তদের পাশে। নিজের জীবন জীবিকা নিয়ে ওর বিশে মাথাব্যথা ছিল না, সব সময়ই ওর মাথায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চিন্তা ঘুরত।

জরুরি অবস্থায় সবরকম প্রতিবাদী কাজকর্মই একরকম বন্ধ, অথচ মানুষের অভাব অভিযোগ, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস লেগেই রয়েছে। অপুর প্রতিবাদী মন ছটফটিয়ে মরছে আর মাথা থেকে বেরোচ্ছে নতুন নতুন ফন্দিফিকির। ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে শ্লোগান তুলে, মিছিল করে, লিফলেট বিলি করে আবার ভিড়ে মিশে যাওয়ার মতো কাজের মধ্যে দিয়েই অপু তার প্রতিবাদী মনটাকে শান্ত করত।

এই সময়ই একদিকে বালিতে চলছে সান্ধ্য স্কুল, অন্যদিকে বেলেঘাটা অঞ্চলে গড়ে উঠল ইস্ট ক্যালকাটা সোশিও কালচারাল অরগানাইজেশন। চলল বিজ্ঞানকে গণমুখী করার কাজ। নাটকের দলে ভিড়ে গিয়ে মানুষের সমস্যা নিয়ে নাটক করা, গণসঙ্গীতের দল তৈরি করা ইত্যাদি নানাবিধ কাজের মধ্যে ব্যস্ততার পাশাপাশি ছিল ওর পারিবারিক দায়িত্বশীলতা। অকালে চলে গিয়েছিলেন মা। তাই সাংসারিক কাজে দিদিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা এবং দিদিকেও সংসারের বাইরে এনে সামাজিক কাজে যুক্ত করার প্রয়াসও ওর ছিল।

অপুর কাজের ফিরিস্তি বা ওর যুক্ত থাকা সংগঠনের নামের তালিকা দীর্ঘায়িত না করে বলি, ওর হাতে গড়া সংগঠন *এবং ছাত্রছাত্রী*-র কথা। জীবিকার প্রয়োজনে শুরু করলেও *এবং ছাত্রছাত্রী* মূলত দুঃস্থ অভাবী ঘরের ছেলেমেয়েদের পাশে দাঁড়ানোটাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। বিনামূল্যে টেস্ট পেপার বিলি থেকে শুরু করে, আমলাশোলের নিরন্নদের দু-মুঠো খাবার পৌঁছনো, আয়লা বিধ্বস্ত সুন্দরবনে ত্রাণ নিয়ে ছুটে যাওয়া। অপুর এবং ছাত্রছাত্রী-র ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার পাশাপাশি এসবও করে গেছে।

বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী অপু কিছুতেই অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করতে পারত না। মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরে বসে যাওয়া একদা কাছের মানুষকেও সমালোচনা করতে ও কখনও ছাড়েনি। তাই আপাতভাবে আমার চুপচাপ হয়ে যাওয়াটাও ও মানতে পারে নি। চেয়েছিল একটা বোঝাপড়া করতে। কিন্তু ক্যানসারের মতো মারণ রোগ ওকে করতে দিল বোঝাপড়া, আর আমাকেও সুযোগ দিল না ওর সমালোচনায় ঋদ্ধ হতে।

আজকের দিনে অপূর্বর মতো ছেলেদের বড়ই দরকার। অথচ এই দরকারি সময়েই মাত্র ৫৬ বছর বয়সে অপু চলে গেল। ওর চলে যাওয়ার ক্ষতি শুধু ওর পরিবারের নয়, এ ক্ষতি আমাদের, ফুলবাগান অঞ্চলের অগণিত সাধারণ মানুষের। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল অপুর, কাছের মানুষজন বেসরকারি জায়গায়/ নার্সিং হোমে নিয়ে যাবার তোড়জোড় শুরু করে। টাকাও জোগাড় হয়। অপুকে প্রস্তাবটা দেওয়া মাত্র প্রত্যাখ্যান করে। 'ও টাকাটা অভাবী কোনও অসুস্থ মানুষের কাজে লাগান।' এই ছিল আমাদের সবার 'অপু'।

অপু ভুল চিকিৎসায় মারা গেল। পাকস্থলীতে অপারেশনের পর ও দিব্যি সুস্থ হয়ে উঠছিল। ওকে ভেলোরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানকার ডাক্তারদের পরামর্শমতো কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (ডে কেয়ার-এ) ওর কেমোথেরাপি চালু হয়। অঙ্কোলজির ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক কেমোর মাত্রা ঠিক করে দেন। হঠাৎ করে অপুর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকায় ওকে ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে অঙ্কোলজি বিভাগে দেখানো হয়। বিভাগীয় প্রধান সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কেমোর মাত্রাতিরিক্ত ডোজের জন্যই অপুর অবস্থার অবনতি—এসব বেশ জোর দিয়েই বলেন তিনি। তখন আর কিছু করার ছিল না। চিকিৎসকের ভুলের মাশুল দিতে হল অপুকে ও তার অগণিত ভালবাসার মানুষকে। আমরা 'এমন তো কতই হয়' বলে বসে থেকে আমাদের দায়িত্ব পালন করব?

প্রতিদিন এই সমাজ ব্যবস্থা আমাদের সকলকে একটু একটু করে পচিয়ে দিচ্ছে। এর হাত থেকে বাঁচার উপায় হল—বিপন্ন মানুষ, দুঃস্থ মানুষের পাশে থাকা।

একা একা বাঁচিস না। আর পাঁচটা মানুষের হাত ধরে বাঁচ। বিপদ প্রত্যেকের জীবনেই আসবে, যখন মানুষের প্রয়োজন সবার আগে, তখন মানুষ পাবি। মৃত্যুকে ভয় পাস না। মৃত্যু যেমন জীবনের শেষ তেমনি আবার শুরুও বটে।

মানুষ বেঁচে থাকে শরীরে নয়, চিন্তায় চেতনায়। সেই চেতনাই হল দৃষ্টিভঙ্গি। তাই দৃষ্টিভঙ্গি হারিয়ে বসলে মানুষ নিজেকেই হারিয়ে বসে, তখন বেঁচে থাকে শুধুই মানুষের শরীরটা। শুরু হয় শুধু শরীর টেনে চলার ক্লান্তিকর যন্ত্রণা।

-অপূর্ব মুখোপাধ্যায় (ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে)

**পূরবী ঘোষ**
উমা

# ক্ষতিকর বর্জ্য: সমস্যা ও সমাধান

পি পি সিংগল

ভারতের রাজধানীতে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের উৎস খুঁজে পাওয়া গেছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। 'গামাসেল' নামের এক যন্ত্রে থাকে এক তেজস্ক্রিয় পদার্থ। এরকম একটি যন্ত্রের ব্যবহার সেখানে ১৯৮৫ সালেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল, আর তার অনেক পরে ২০১০ সালে কোনো এক পুরানো জিনিস কেনাবেচার ব্যবসায়ীর কাছে সেটাকে বেচা হয়েছিল।

নিয়ম অনুসারে যন্ত্রটির ব্যবহার বাতিল করে দেওয়ার আগে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত ছিল পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রক পর্ষদকে (এ ই আর বি) জানানো, যাতে তারা যন্ত্রটিকে মুম্বইতে অবস্থিত ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে রীতিমাফিক বাতিল করতে পারে। এক্ষেত্রে সম্ভবত তা করা হয়নি।

এরকম কথাও শোনা যাচ্ছে যে, এই ধরনের সম্ভাব্য ক্ষতিকর পদার্থ নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য কোনো নির্দেশিকা নেই, যদিও পরমাণু শক্তি বিভাগ (ডি এ ই) দাবি করে, এরকম নির্দেশিকা আছে। এমনকি এটাও জানা গেছে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তেজস্ক্রিয় নিরাপত্তা আধিকারিক (আর এস ও) ছিল না।

২০০০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এ ই আর বি এই ধরনের ১৬টি ঘটনার অনুসন্ধান করেছে। যখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, একমাত্র তখনই ক্ষমতার অলিন্দ জুড়ে আশঙ্কার হিমস্রোত বয়ে যায়। পরে অবশ্য যথারীতি সব কিছু ভুলে যাওয়া হয়। সেই কারণে সর্বনাশ ঘটতেই থাকে, আর প্রতিবারই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হয় আগের বারের তুলনায় বেশি।

বেশ কিছুকাল ধরেই ক্ষতিকর বর্জ্যের পরিমাণ বেড়েই চলেছে। গুজরাটের অলং-এ জাহাজ ভাঙার কারখানা তথা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, পরমাণু চুল্লী ইত্যাদি থেকে ক্ষতিকর পদার্থের নির্গমণ এর কারণ।

আরো বেশি উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে বিপুল পরিমাণ ইলেকট্রনিক বর্জ্যের (ই-বর্জ্য) সৃষ্টি। শিগগিরই আমাদের সম্মুখীন হতে হবে কমপ্যাক্ট ফ্লুয়োরোসেন্ট ল্যাম্পের (সি এফ এল) অপসারণজনিত সমস্যার, কারণ এর ব্যবহার খুব দ্রুত বাড়ছে। অনেকেই হয়ত জানি না, ২০০৯ সালে আমাদের দেশে ৫৯ লক্ষ টন ক্ষতিকর বর্জ্য উৎপন্ন হয়েছে, আর আমরা আমদানি করেছি ৬৪ লক্ষ টন ক্ষতিকর বর্জ্য। সব মিলিয়ে গত তিন বছরে আমাদের দেশে ক্ষতিকর বর্জ্যের বৃদ্ধির হার শতকরা ৪৮ ভাগ।

যদি আমরা নির্দিষ্ট করে ই-বর্জ্য (মোবাইল ফোন/চার্জার, রিমোট, সিডি, হেডফোন, ব্যাটারি, মনিটর, প্রিন্টার, সিপিইউ, এলসিডি/প্লাজমা টিভি, রেফ্রিজারেটর, এয়ার-কন্ডিশনার ইত্যাদি) নিয়ে কথা বলি, তাহলে জানবেন যে, আমাদের দেশ প্রায় দেড় লক্ষ টন স্তূপাকৃতি ই-বর্জ্যের পাহাড়ে চড়ে আছে। ২০১২ সালে এর পরিমাণ বেড়ে আট লক্ষ টন হবে বলে অনুমান। শুধু দিল্লিতেই প্রতি বছর প্রায় ১২ হাজার টন ই-বর্জ্য উৎপন্ন হয়ে থাকে।

জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে ভারতকে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ই-বর্জ্য উৎপাদক দেশ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বস্তি আর শিল্পাঞ্চলে বেড়ে ওঠা অসংগঠিত ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে ই-বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের পীঠস্থান। এর ফলে উৎপন্ন হচ্ছে দস্তা, পারদ আর

ক্যাডমিয়ামে ঠাসা ক্ষতিকর সব গ্যাস। অথচ, যদি নিয়ম নীতি মেনে চলা হয়, তাহলে এই কাজ করা উচিত উচ্চ কারিগরি ক্ষমতাসম্পন্ন কারখানায়, যেখানে স্বাস্থ্য আর পরিবেশ বিধি কঠোরভাবে মেনে চলা হয়।

প্রসঙ্গত, নষ্ট হয়ে যাওয়া সিএফএল-এর মতো জিনিস থেকে সৃষ্ট ক্ষতিকর বর্জ্য নিয়ে কিছু কথা বলা যাক। আমাদের এটা জানা দরকার, ২০০৯ সালে দেশ জুড়ে ২৫.৫ কোটি সিএফএল বিক্রি হয়েছে। শক্তি দক্ষতা ব্যুরো শিগগিরই 'বচৎ ল্যাম্প যোজনা' চালু করতে চলেছে। এর উদ্দেশ্য ২০১২ সালের মধ্যে ভারতে ২০ কোটি পরিবারে সিএফএল পৌঁছে দেওয়া।

ভারতে ব্যবহৃত এরকম প্রতিটি ল্যাম্পে থাকে ১৩ মিলিগ্রাম পারদ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ইওরোপীয় ইউনিয়নে এর পরিমাণ মাত্র এক মিলিগ্রাম)। এই পারদ অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এখনো পর্যন্ত এর কোনো যথাযথ অপসারণের ব্যবস্থা নেই। আমরা কি জানি যে পারদ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র, যকৃৎ আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে নষ্ট করে দেয়?

এই ল্যাম্পের নিরাপদ অপসারণ আর পুনর্ব্যবহারের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রক বছর দুয়েক আগে বিশেষজ্ঞদের একটি প্যানেল তৈরি করেছিল। একই ভাবে মধ্য, পশ্চিম, পূর্ব আর দক্ষিণ দিল্লিতে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা বি এস ই এস-এর কথা ছিল ফিউজ কেটে যাওয়া সিএফএল ল্যাম্প সংগ্রহ করার জন্য ১৩০টি কেন্দ্র খোলার। এইসব খারাপ ল্যাম্প থেকে পারদ নিষ্কাষন এবং সেগুলিকে নষ্ট করার জন্য পুনেতে এক বিশেষ কেন্দ্রে পাঠাতে হয়। এইসব পরিকল্পনার কী হল জানা নেই, কারণ পুরসভার জঞ্জালের মধ্যে এরকম বহু ল্যাম্প দেখতে পাওয়া যায়।

এরকম এক ভয়ঙ্কর অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিকর বর্জ্যের সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য নীচে পরমার্শগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত প্রয়োজন:

১. পরিবেশ ও বন মন্ত্রক, পরমাণু শক্তি বিভাগ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান সহ সংশ্লিষ্ট সব সংস্থাকে একযোগে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারকারী বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা সংস্থা/হাসপাতাল/পরমাণু কেন্দ্র সহ সব প্রতিষ্ঠানের জন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংগ্রহ, মজুত, ব্যবহার এবং অপসারণ সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকা তৈরি করতে হবে।

২. তেজস্ক্রিয় নিরাপত্তা আধিকারিকের ঘাটতি অবিলম্বে পূরণের জন্য পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে আরো বেশি করে পদ সৃষ্টি করতে হবে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও প্রশিক্ষণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হবে।

৩. ই-বর্জ্য এবং খারাপ/নষ্ট সিএফএল আর টিউবলাইটের অপসারণ ও পুনর্ব্যবহারের নিয়ন্ত্রণকল্পে পরিবেশ ও বন মন্ত্রককে উপযুক্ত নিয়মাবলী রচনা করতে হবে এবং সেগুলির প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে।

৪. পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর পদার্থ সংক্রান্ত সব আইনে আইন ভঙ্গকারীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি কারাবাসের ব্যবস্থা করতে হবে (দেখতে হবে যেন কোনোমতেই এতে কোনো ছাড় না মেলে), কারণ আর্থিক জরিমানা করে এই গুরুতর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

৫. ক্ষতিকর বর্জ্যের আমদানি সাধারণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। দেশের যে ছ'টি বন্দর দিয়ে ক্ষতিকর বর্জ্য ঢোকে, সেগুলিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ চিহ্নিত করার জন্য উন্নত মানের স্ক্যানারের ব্যবস্থা করতে হবে। এইসব বন্দরে কর্মরত কাস্টম অফিসারদের এ কাজে উপযুক্ত দক্ষতা থাকতে হবে।

৬. কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (সি পি সি বি) এবং রাজ্য পর্ষদগুলিকে অবশ্যই শিল্প সংক্রান্ত পরিবেশ আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা সত্যি যে, বর্তমানে এই আইন বলবৎ করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট শৈথিল্য রয়েছে।

**অনুবাদ: পৃথ্বীশ বন্দ্যোপাধ্যায়**

(নিবন্ধকার জাতিসঙ্ঘের প্রাক্তন উপদেষ্টা; বর্তমানে তিনি পরিবেশ ও দারিদ্র দূরীকরণ উপদেষ্টা রূপে কর্মরত)। ১৯ মে ২০১০, ইকনমিক টাইমস পত্রিকা থেকে অনূদিত।

উ মা

## চিঠিপত্র

**শ্রী যুগলকান্তি রায়ের মন্তব্য প্রসঙ্গে**
(উৎস মানুষ, এপ্রিল-জুন ২০১০)

আইলার কারণটি এই প্রবন্ধে আলোচিতই হয় নি। 'কারণ' একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়। সেটার আলোচনা করতে হলে, যেমন কুষ্ঠ বিষয়ক নিবন্ধটি সম্বন্ধে রায় মহাশয় বলেছেন, অন্য একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ হতে হতো। তিনি একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারতেন এখানে আইলা সম্পর্কে সাধারণ পাঠকের কতগুলি জিজ্ঞাসার উত্তর দেবার চেষ্টা হয়েছে মাত্র।

'দুর্ভাগ্য' 'সৌভাগ্য' কথাগুলিতে রায় মহাশয়ের আপত্তিতে অস্বস্তি হচ্ছে। 'ভাগ্যে' বিশ্বাসী সেও নয়। কথা দুটো 'দুঃখজনক পরিস্থিতি' ও তার বিপরীতকে বোঝাতেই প্রচলিত, সেভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে।

**অঞ্জনকুমার সেনশর্মা**

WB/EC 228 ISSN 0971-5800 R. N. 37275/80 Rs. 20.00

উৎস মানুষ ৩০বর্ষ সেপ্টেম্বর ২০১০ ২০ টাকা

## পুস্তক তালিকা

| ছাপা আছে | | ছাপা নেই |
|---|---|---|
| ১. বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১) সংকলন | ৩৫.০০ | অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে (সংকলন) |
| ২. যে গল্পের শেষ নেই<br>দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | ৪০.০০ | বিজ্ঞান অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড)<br>স্বাস্থ্যের বৃত্ত |
| ৩. বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (৫ম প্রকাশ)<br>সংকলন | ৪২.০০ | প্রমিথিউসের পথে<br>জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান? |
| ৪. প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ<br>অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত | ৩০.০০ | শেকলভাঙা সংস্কৃতি - ৪<br>হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান |
| ৫. তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক (১ম)<br>রণতোষ চক্রবর্তী | ১৮.০০ | সংকলন<br>কী আর কেন |
| ৬. বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু<br>হিমানীশ গোস্বামী | ৪০.০০ | চলতে ফিরতে<br>বিজ্ঞানকে মুখোশ করে |
| ৭. এটা কী ওটা কেন<br>সংকলন | ৩০.০০ | সাপ নিয়ে কিংবদন্তী<br>প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ৪ |
| ৮. 'আমরা জমি দেই নি, দেব না' | ১০.০০ | চেনা বিষয় অচেনা জগৎ (জানুয়ারি ২০০০১ম) |
| ৯. আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান<br>সংকলন | ৫০.০০ | খাবার নিয়ে ভাবার আছে (৩য়)<br>লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি |
| ১০. আরজ আলী মাতুব্বর<br>ভবানীপ্রসাদ সাহু | ২০.০০ | নিজের মুখোমুখি<br>ছেচল্লিশের দাঙ্গা : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় |
| ১১. প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে<br>দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়) | ৬০.০০ | |
| ১২. বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক<br>(একত্রে যন্ত্রস্থ) | | |

বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা-৬৪ ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com ই-মেল :jhilly_banerjee@yahoo.co.in
banerjee.jhillee2@gmail.com

**অস্থায়ী কার্যালয় ও চিঠিপত্রে যোগাযোগের ঠিকানা**

**খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন** বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬

**প্রাপ্তিস্থান**

বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), খড়দা স্টেশন।

**উৎস মানুষ সোসাইটি**'র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক কলকাতা-৭০০০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং শান্তি মুদ্রণ ৩২/৩, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, দূরভাষ-৯৪৩৩০৯৯৯৩১ হইতে মুদ্রিত। বাঁধাই- নিবারণ সাহা।